অচেনাকে চিনে-চিনে

ও অন্যান্য প্রবন্ধ

অশোক মিত্র

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ১৯৬৩

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

মুখবন্ধ

বইটি বেরোলো একান্তই প্রকাশক মশাইয়ের জেদাজেদিতে : তিনি আমাকে প্রায় দড়ি দিয়ে বেঁধে বাধ্য করিয়েছেন এখান-ওখান থেকে, পুরোনো নানা পত্রিকার তাড়া ঘেঁটে, এই প্রবন্ধগুলি একত্র জড়ো করতে। আমার দিক থেকে তাঁকে ধন্যবাদ পৌঁছনোও সেই কারণেই, অন্যথা লেখাগুলি সত্যি-সত্যি হারিয়ে যেত।

অনেকেই হয় তো বলবেন, মহাভারত তেমন-কিছু অশুদ্ধ হতো না তাতে। আমার বিবেচনায়, ঠিকই বলবেন তাঁরা। অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রবন্ধটি যথার্থই প্রাগৈতিহাসিক, একতিরিশ বছরের পুরোনো, লেখকের অন্ধ মমত্ববোধ ছাড়া নতুন ক'রে তাকে উপস্থাপন করার কোনো হেতু নেই। তবে, জীবনানন্দ-সমাচ্ছন্নতার উদ্যোগপর্ব চিহ্নিত করার দিক থেকে বিচার করলে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবিদ্‌দের কাছে রচনাটির যৎসামান্য মূল্য থাকলেও থাকতে পারে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত প্রবন্ধটি শ্রুতিলিখন, ভাষাব্যবহারে ঈষৎ শিথিলতার সেটাই কারণ।

অন্য যে-কথা আলাদা ক'রে না বললেও অনুকম্পায়ী পাঠক অনুধাবন করবেন, গ্রন্থিত বেশ কয়েকটি লেখায় মৃত্যুর বিষণ্ণ ছায়া। এধরনের প্রতিটি প্রবন্ধই, সম্পাদকদের অনুরোধক্রমে, কোনো-না-কোনো মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে রচিত, তাৎক্ষণিক মন্তব্য-বিশ্লেষণ তাই আবেগরহিত নয়। অতীতরোমন্থনের পরিমাণ, একই কারণে, একটু বেশি।

নামপ্রবন্ধটি কিন্তু অপর কথা বলে। সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্যসংগীত-শিল্পকলা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, যদিও এখানে দায়ভার উভপাক্ষিক। স্বপ্নের পথ ধ'রে সমাজকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে কোনো-কোনো পর্যায়ে শিল্পসাহিত্যকেও নায়কত্ব দিতে হয়; সমাজের সামগ্রিক সত্তা থেকে শিল্পী-কর্মীগুণী যেমন প্রেরণা নিষ্কাশন করেন, পাশাপাশি, সমাজকে প্রেরণা তথা সাহস জোগানোও শিল্পীকর্মীগুণীর দায়িত্বের হিশেবের মধ্যে পড়ে। 'অচেনাকে চিনে-

চিনে' প্রবন্ধটি, তার অতিকথন সত্ত্বেও, এই দায়িত্বের সারাৎসার নিয়ে ভাবিত, সেই ভাবনায় কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ পুরোপুরি অনুপস্থিত, কল্পনানির্ঝরের প্রসঙ্গই বড়ো আকারে দেখা দিয়েছে।

প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ', 'উত্তরসূরি', 'বিভাব', 'শতভিষা', 'সাহিত্যচিন্তা', 'কথাসাহিত্য', 'সত্তরের যীশু', 'বারোমাস' ও 'জলার্ক' পত্রিকায়।

অশোক মিত্র

বিবেকের কাছে

ভয়চকিত মফস্বলের মানুষ, কলকোলাহলমুখর নগরজীবনের সঙ্গে তাঁর কোনো-দিন অন্বয় ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা দেশের সে-মফস্বলশান্তি আর ফেরবার নয়। দেশভাগের কথা ছেড়ে দিলেও, আধো-শহর আধো-গ্রাম যে-রূপবতী বরিশাল, তা হারিয়ে গেছে কোথায়। সেই নারকেল-সুপুরির সারি, শুরকি-ছাওয়া শড়কের পাশে খাল, খালের ওপারে নিবিড় ঘিরে আসা পল্লীশ্রী ; খোড়ো ঘর, ঘাস, ধান, শিরীষ, আম, জাম, নিম, জামরুল। কোঠাবাড়ির পিছনে স্তব্ধতা, টলমল পুকুর, হাঁস, মাছ, শামুক, গুগলি। শুপুরির দীর্ঘ ইশারা বেয়ে সন্ধ্যা ; পেঁচা, ডাহুক আর ঝিঁঝিঁ, বিশাল আকাশ জুড়ে অনন্ত নক্ষত্র। অপেক্ষাকৃত ঘনতর বসতি ছাড়িয়ে গেলেই হয় তো ধানসিঁড়ি নদীর ঢল, শর-কাশ-হোগলার বন, তারই পাশে বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে প্রান্তরের নীরবতা। আরো-একটু এগিয়ে গেলে এমনকি পলাশবনের ভিড়েই হারিয়ে যাওয়া যাবে বোধ হয় : কে জানে, হীরা-ঝরা চোখ নিয়ে দু'একটা হরিণই খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে।

এই পরিবেশে জীবনানন্দ নিজের মনে কবিতা লিখে গিয়েছিলেন বিশ-তিরিশের বছরগুলো ভ'রে। শান্তির কবিতা, শ্রান্তির কবিতা ; গোরু, ঘোড়া, হরিণ, ঘাস, কীটপতঙ্গ, পাখিপাখালির পরিমণ্ডলে যে-শান্তি, সেই একবুক শান্তির কবিতা। 'হাঁসের নীড়ের থেকে খড় পাখির নীড়ের থেকে খড় ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত শীত আর শিশিরের জল' এরকম অখণ্ড উপলব্ধির কবিতা। উদ্ভিদ্‌জীবনের, প্রাণীজীবনের, গৃহস্থজীবনের অনায়াস নিয়মকলায় যে-কোমল পরিপূর্ণতা ব্যাপ্ত, তার কবিতা। অথচ জীবনের আরো গভীরে যে-কান্না, প্রেম-অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতা সব-কিছুর পরেও যে-বিপন্ন বিস্ময়ের আলোড়ন, সেই বিক্ষোভের কাব্যও।

সত্যিই আমাদের পৃথিবীর ছিলেন না কোনোদিন। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, সভ্যতার সঙ্গে শান্তির যে-সংঘর্ষে ক্রমেই হ'টে যাচ্ছে প্রকৃতি, ফুরিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর শৈশবস্বস্তি, সেই দ্বন্দ্বে বুনোহাঁস-হরিণ-শঙ্খচিলের মতো তিনিও অহরহ নিহত হচ্ছিলেন। যে-পৃথিবী 'প্রদাহ প্রবহমাণ যন্ত্রণা', তার ভয়াবহ আরতি এড়িয়ে 'অন্ধকারের সারাৎসারে' মিশে যাওয়ার ক্ষুব্ধ আকূতিতে অতএব কোনো অনৃততা ছিল না। জড় ও উদ্ভিদ্‌জগৎ নিয়ে প্রগাঢ় সংবেদনাশীল কাব্য অবশ্য পৃথিবীর সাহিত্যে আজ পর্যন্ত অজস্র রচিত হয়েছে, কিন্তু জীবনানন্দ অনন্যতা ছুঁয়ে গেছেন এই কারণে যে তাঁর কাব্য নিজক সংবেদনার নয়, পরম অন্তর্বেদনার। 'কোনো নিবিড় ঘাসমাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার' থেকে নেমে জন্মলাভ করবার যে-আনন্দ, একটি কচি ঘাসের চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে না-পারলে সেই অনুভূতির ঐরূপ শাণিত প্রকাশ অসম্ভব ব'লে মনে হয়। বিষয়কে নিজের কবিসত্তা থেকে জীবনানন্দ কখনো আলাদা ক'রে দেখেননি; বিষয়কে আশ্রয় ক'রে একটি সম্পূর্ণ চেতনা কল্পনা করেছেন, সেই চেতনাকে সম্মানের সঙ্গে পরিচর্যা করেছেন, সব শেষে মানবিক হৃদয়ের অনুভূমিকাতে সে-চেতনার আন্তরিকতম প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ('যেই সব শেয়ালেরা' কবিতাটি তাঁর কল্পনার এই অদ্ভুত প্রক্রিয়ার পরাকাষ্ঠার নিদর্শন হয়ে থাকবে।)

জীবন, পৃথিবী, প্রকৃতি, সব-মিলিয়ে, সব-জড়িয়ে, সব-কিছু অতিক্রম ক'রে যে-শান্তি, যে-শ্রান্তি: এ-সমস্ত বোধবিষাদের প্রসঙ্গ নিয়ে জীবনানন্দ বাংলা দেশের মফস্বলে কাব্যরচনা ক'রে গিয়েছিলেন। অনুভবের গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যের কোনো তুলনাই নেই। অথচ এ-স্বীকৃতি পাবার জন্য তাঁকে দীর্ঘ দিন ধ'রে কৃচ্ছ্রসাধনার সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছে। 'প্রগতি'-'কল্লোলে'র উদ্দাম অধ্যায়ে জীবনানন্দের দিকে তাকাবার মতো অবসর কারো ছিল না। অনেক ব্যক্তিত্বশালী বিচিত্র পুরুষেরা তখন অঙ্গন মুখর ক'রেছিলেন: বরিশালের নির্জন আকাশ নিয়ে হিজিবিজি কল্পনাকাকলি তাই একপাশে চুপচাপ প'ড়ে থেকেছে। আরো বছর-দশেক বাদে 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে যে-আধুনিক কাব্য-আন্দোলন শুরু হ'লো, তারও প্রধান স্রোত থেকে তিনি বাদ প'ড়ে গেলেন। কারণটি স্পষ্ট। এ-কথা বললে এখন বোধহয় আর কোনো দ্বিরুক্তি হবে না যে নিতান্তই বিদেশী সাহিত্যের পরিমণ্ডল থেকে বাংলা কাব্যের সেই অধ্যায়ের মূল প্রেরণা এসেছিল। 'মননশীল' কাব্যরচনার ধুয়োতে হাওয়া তখন ভারি। তত্ত্ব এবং

ভঙ্গি, দুয়েতেই চাতুর্য তথা পাণ্ডিত্যের রাজযোটক না-ঘটলে সে-রচনা সার্থক নয়, এ-রকম এক তুখোড় কানাঘুষোর কাল গেছে সেটা। আবেগ-প্রধান, বিশুদ্ধ প্রেরণাধর্মী কবিতার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সহজ ক'রে সহজ কথাটা বলবার মতো বালখিল্যতা আর নয়, ইত্যাকার নানা অভিমত সেই দশকের কাব্য-সমালোচনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। এরূপ দৃঢ়চক্র প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনানন্দের কাব্যের কোনো ব্যাপক সমাদর হওয়া সম্ভব ছিল না। 'মাঝে-মাঝে ভালো উপমা দিয়ে থাকেন, কিন্তু ওসব ক'রে আর কী হবে' : বাঁকা ঠোঁটে এ-ধরনের অক্ষম উক্তি ক'রেই অনেক বিদগ্ধ সমালোচক নিজেদের কর্তব্য সুচারু-সম্পন্ন ব'লে ভেবে নিয়েছিলেন। বালিশে মাথা রেখে যাঁদের ঘুমোবার, তাঁরা ঘুমিয়েই ছিলেন : একমাত্র সম্মানীয় ব্যতিক্রম, বলতেই হয়, বুদ্ধদেব বসু।

এই উন্নাসিক কাব্যদর্শনের অসারতা প্রমাণ হ'তে-হ'তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শেষ হয়ে এলো। শুভবোধ যেহেতু কালজয়ী, সেই 'মননধর্মী'-পর্বের খুব অল্পসংখ্যক কবিতাই সময়ের উচ্চাবচতা ডিঙিয়ে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। অন্য পক্ষে, প্রতীক্ষার খিন্ন গোধূলিলগ্নে, তাঁর প্রাপ্যের সামান্য কিছু অন্তত জীবনানন্দ পেতে লাগলেন চল্লিশের দশকের উপান্তে। যে-তরুণতরের দল প্রায় দশ-বারো বছর ধ'রেই তাঁর কাব্যের সঙ্গে সংগোপনে অভিসারব্রতী ছিল, সমকালীন প্রয়াসের নিষ্প্রাণ বিশুষ্কতায় ব্যাহত-বিক্ষত তারা, পূর্বসূরীদের বিচারকে পাশে ফেলে রেখে জীবনানন্দকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে বরণ ক'রে নিলো তারা। জীবনানন্দ-চেতনা তাই বলতে গেলে মাত্র বিগত কয়েক বছরের ফল। কবিতার দেশ নাকি বাংলা, কিন্তু প্রায় কুড়ি বছর ধ'রে কবি প্রতিভার প্রতি যে-অসম্মান জীবনানন্দের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসধারায় তা কলঙ্কের এক চরম চিহ্ন হ'য়ে থাকবে।

২

আঘাতের বেদনা আমাদের কাছে এতটা দুর্বিষহ লাগছে এই কারণেই : বরাবরই অনুভব ক'রে এসেছি জীবনানন্দে একমাত্র আমাদেরই অখণ্ড অধিকার। আমরা এখন যারা তিরিশের এদিকে-ওদিকে, জীবনানন্দ-বিভোর কৈশোর কেটেছে আমাদের সকলের। বৈয়াকরণেরা বিমুখ : তাঁকে আমরাই তো আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের উপভোগের নিবিড়তা দিয়ে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়ের তুলনা নেই ; যেন সব-ক'টি ইন্দ্রিয়ের যৌথ মধ্যবর্তিতায় নতুন একটি

ভূমণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টে গেলো। আমাদেরই পৃথিবী, প্রত্যহের স্পর্শ-স্বাদ-গন্ধের প্রত্যেকটি বিভঙ্গই উপস্থিত, অথচ নতুন ক'রে তাকে চিনতে শিখলাম। চেতনাতে কোনো মোহিনী মায়ার জাদু এসে লাগলো, স্নায়ুতে-শিরায়-তন্ত্রীতে আমূল কোনো বিপ্লব। অভ্যস্ত পরিচিত রূপ বদলে গেলো, রূপকথা হয়ে ফিরে এলো; গন্ধে এলো শিহরিত বিভাস; স্পর্শে পৃথক এক রোমহর্ষ। জীবনকে, মৃত্যুকে, কান্নাকে, কাব্যকে হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে শিখলাম: ঘাস আর শিশিরের জলের সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে মিশে গেলাম: কীটপতঙ্গ-পশু-পাখির হৃদয়রেখার গহনে আমরাও স্বতঃসিদ্ধতা হ'য়ে প্রবেশ ক'রে গেলাম যেন। চালের ধূসর গন্ধ-মাখা তরঙ্গ দু'বেলা যে নির্জন মাছের চোখে রূপ হয়ে ঝ'রে যায় তা আর আমাদের কাছে কষ্টকল্পিত তত্ত্ব হ'য়ে রইলো না, বিশ্বাসেরও আরো অনেক গভীরে, সেই অনুভব আমাদের চেতনায় রূপান্তরিত হলো। কৈশোরের সিঁড়িতে সদ্য-পা-দেয়া আমরা, জীবনানন্দের কাব্যে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আবিষ্কার ক'রে উল্লসিত, চকিত, অভিভূত হয়ে গেলাম। সে এক অদ্ভুত মমতা-মাখানো অধিকারবোধ, আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত: সে-সাম্রাজ্য আমরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম, সে-সাম্রাজ্য সুতরাং আমাদের। শোকের এই নিদারুণ মুহূর্তে দাঁড়িয়েও এখনো সেই গর্ব।

৩

কিন্তু গর্ব ক'রেই বা কী হবে, আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বের কতটুকুই বা আমরা পালন করেছি। তাঁর কাব্য নিয়ে মাতামাতি করেছি প্রচুর, অথচ ব্যক্তিহিশেবে তাঁকে প্রায় ভুলেই থেকেছি। বিগত সাত-আট বছর নানা কৃচ্ছ্রের মধ্যে তাঁর দৈনন্দিনতা কেটেছে। বিভিন্ন অভিজাত সাহিত্যিক-গোষ্ঠি কোনোদিনই তাঁকে গ্রহণ করেনি: লোকমঞ্চ থেকে দূরে, জীবনানন্দ চুপি-চুপি পালিয়ে বেড়াতেন কলকাতায়। তরুণতরদের মধ্যে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা অজস্র হওয়া সত্ত্বেও কাউকেই তাঁর কাছে তেমন যাওয়া-আসা করতে দেখা যেত না। অথচ, স্বভাবগত প্রাথমিক জড়তাটি কাটিয়ে উঠলে, লোক-সমাগমে জীবনানন্দ আনন্দ পেতেন, ভরসা পেতেন। এই হতভাগ্য দেশে, কবিকর্মের সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতার যেখানে নিশ্চিত আড়াআড়ি, অনুরাগী পাঠকদের মুগ্ধতাবোধের প্রত্যক্ষ আন্তরিক জবানবন্দিও কবির তৃপ্তির পক্ষে অনেকখানি। অতটুকু অর্ঘ্যও তাঁকে পৌঁছে দেয়া হয়নি।

আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে গত চার-পাঁচ বছরে তাঁর একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তাসম্বন্ধ গ'ড়ে উঠছিল। চতুর পৃথিবীর কলরোলের ক্লান্তিকে পিছনে ফেলে রেখে নিমগাছের আশ্চর্য ছায়া-আঁকা উঠোনসম্পন্ন তাঁর বাড়িতে মাঝে-মাঝে গিয়ে হাজির হয়েছি। বারান্দার মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসতাম, নিমগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে হয় তো জ্যোৎস্না এসে পড়তো—কী-এক জাদুবলে পৃথিবীর সমস্ত শব্দ ডুবে যেত—অনেক সরল প্রাণখোলা গল্প হতো তাঁর সঙ্গে। পর্যাপ্ত খুশির একটা আমেজ ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। কোনো কথার প্রসঙ্গে রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে হঠাৎ প্রাণবন্ত হেসে উঠতেন তিনি, কৌতুকে চোখ দুটি নৃত্য ক'রে উঠতো। যতবারই গেছি কৃতজ্ঞ অন্তরে ফিরে এসেছি: প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, যেন পৃথিবীর নিষ্পাপ বিস্ময়ের শৈশব থেকে আনন্দ আহরণ ক'রে এলাম।

অথচ, করুণ আক্ষেপ হয় এখন, খুব বেশিদিনও যাইনি। বহুবিধ নাগরিক উত্তেজনায় ব্যস্ত আমার, কবিদর্শন তো এর মধ্যে বিরলতম ব্যাপার: বিবেকের কাছে আজীবন এখন জবাবদিহি দিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া আরো যা মনে হয়, তাঁর জাগতিক সুখসংবিধানের জন্য আমাদের কিছু দায়িত্ব নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে-দায়িত্ব মেটাবারও তেমন-কোনো তন্নিষ্ঠ চেষ্টা আমরা করিনি।

'সূর্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মতো নেই আর; হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো', এরকম একটি উপমাও যিনি কল্পনা করতে পেরেছেন, তাঁর আসন মহত্তম কবির পর্যায়ে: আন্তরিকতার উৎসাহে এধরনের কথা বহুবার চেঁচিয়ে ব'লে বেড়িয়েছি। এই মতের সপক্ষে অনেক কিছু বলবার ছিল, আছে—হয়তো মনে-মনে ভাবাও ছিল সে-সব কথা—কিন্তু আমাদের উৎসাহ, স্বীকার করতেই হয়, আজ পর্যন্ত তেমন সুষ্ঠু দানা বাঁধেনি। আমাদের আন্দোলনে অধিকতর ঋজুতা আর দার্ঢ্য থাকলে হয়তো বা মৃত্যুর আগে জীবনানন্দকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানের একটি বৃহৎ অংশই কৃতজ্ঞ নম্রতার সঙ্গে সাজিয়ে নিবেদন করতে পরতাম।

জীবিকানির্বাহের তাড়নায় প্রবাসে প'ড়ে থাকবো। দু'বছর-তিন বছর বাদে অল্প কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসবো, দেশপ্রিয় পার্কের কোণে বাস থেকে নামবো, ট্রাম-লাইনের দিকে চোখ পড়ামাত্র ছলাৎ ক'রে উঠবে হৃদয়: আকাশে ঝিকিমিকি শরতের রোদ্দুর, নিজের বিবেকের কাছে আরেক-বার মাথা হেঁট হবে।

১৯৫৫

প্রসঙ্গ ধূর্জটিপ্রসাদ

বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নিছকই গবেষণা করেন তাঁদের বাদ দিয়ে ইদানীং কেউ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা-টেখা নিয়ে মাথা ঘামান না। তবে সেটা তেমন বড়ো কথা নয়, কারণ আরো বড়ো সন্দেহ যে হয় তো প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলি নিয়েও আজকাল তেমন-কিছু আর ঘাঁটাঘাঁটি হয় না, শুধুমাত্র কিছু 'বিশিষ্ট' পাঠকই তাঁর লেখা পড়েন। এটা হওয়াই বোধ হয় নিয়ম, কেননা এখন সাধারণ-ভাবে বাংলা সাহিত্যের মান, সেই সঙ্গে সাহিত্য-উপলব্ধির মান, ভয়ে-ভয়ে হ'লেও বলতে হয়, ভয়ংকররকম নিম্নগামী। সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের ভিতর তফাৎ সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হয়েছে, এবং সেটা মুছে দিয়েছেন যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে গত কুড়ি বছরে একেবারে বাজারি ব্যবসায় রূপান্তরিত করেছেন। নিজেদের প্রয়োজনেই তাঁরা এরকম একটি ব্যবস্থার অবলম্বন নিয়েছেন। সুতরাং খুব বড়ো মাপের আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই। যতদিন পর্যন্ত কিছু সৎ সাহিত্যসেবী সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বিরাট পরিবর্তন সংসাধন করতে না পারবেন, ততদিন এই ধরনের বিস্মরণের পালা চলতে থাকবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা হ'লেও যাঁরা নিজেদের চেষ্টাতেই বাংলা সাহিত্যের ধারা নিয়ে পড়াশোনা করতে চান, তাঁদের পক্ষে এক মস্ত তাৎপর্যের ব্যাপার হবে যদি তাঁরা একটু সময় ক'রে প্রমথ চৌধুরীতে ফিরে যেতে পারেন, এবং প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যিনি, অর্থাৎ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের, রচনাবলির জন্য একটু সময় আলাদা ক'রে দিতে পারেন।

সবচেয়ে মূল্যবান যা আমরা ধূর্জটিপ্রসাদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম : যে ক'রেই হোক, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর সাহিত্যের যোগাযোগ ঘটাতে হবে। অবশ্য এই যে সচেতন হওয়া বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে, সেটাও একটু-একটু ক'রে কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে

'সবুজপত্রে'র যে-পরিমণ্ডল, তা থেকে উৎসাহ সংগ্রহ ক'রে প্রমথ চৌধুরীমশাই ইংরিজি সাহিত্যের বাইরে গিয়ে ফরাশি সাহিত্যে কী ঘটছে না-ঘটছে, অন্যান্য ভাষার মধ্যবর্তিতার একেবারে সমকালীন সাহিত্য কী তৈরি হচ্ছে, এ-সব নিয়ে প্রচুর লেখা ছাপিয়েছেন। যা অন্তত বাঙালিদের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার পক্ষে খুব বড়ো একটা সোপান হিশেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তা 'সবুজপত্রে'র গ্রন্থ-পরিচয়। বিদেশি গ্রন্থ—এমনকী অ-ইংরিজি বিদেশি গ্রন্থ, তা উপন্যাসই হোক, দর্শনগ্রন্থই হোক, বা জীবনীই হোক—'সবুজপত্রে' সর্বদা সমালোচিত হতো, এবং সমালোচকদের মধ্যে নিয়মিত যে-নামটি দেখা যেত তা ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। সেই ঐতিহ্যই অব্যাহত রইলো যখন 'পরিচয়' পত্রিকা ১৯৩১ সাল থেকে প্রকাশিত হ'তে শুরু করলো। বাংলা সাহিত্যের কিছু জানবার আছে পৃথিবীর সাহিত্যের কাছ থেকে, এবং পৃথিবীর সাহিত্য মানে শুধু ইংরিজি ভাষায় লেখা সাহিত্য নয়, তারও বাইরে যে একটা বড়ো পৃথিবী প'ড়ে আছে তা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা আমাদের শেখালেন। সে-শিক্ষার মূল্য অঢেল। এক ধরনের কূপমণ্ডুকতার মধ্যে এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু মাঝখানে অন্তত পঁচিশ-তিরিশটা বছর ছিল যখন বাংলা সাহিত্য নিজেকে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে ভাববার চেষ্টা করেনি। অন্তত এই স্পর্ধাটি ছিল যে আমরা পৃথিবীর সাহিত্যের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করবো। খবরের কাগজের প্রতিদিনের কলমের সঙ্গে পেরে উঠবে কিনা এই প্রতি-যোগিতাই বাংলা সাহিত্যের এখন মুখ্য উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদর্শের এই অবগমন দেখলে ধূর্জটিপ্রসাদের সমকালীন সাহিত্যিকরা গভীর বেদনা পেতেন। তাঁদের আদর্শ থেকে কত দূরে যে আজ আমরা স'রে এসেছি তা তাঁদের যে-কোনো রচনার সঙ্গে ইদানীং যে-ধরনের লেখা প্রবন্ধ হিশেবে সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রিকায় ছাপা হয় তুলনা ক'রে পড়লেই বোঝা যায়।

যেটা বিশেষ ক'রে উল্লেখ প্রয়োজন তা ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষাসৌকর্য। শুধু বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় নয়, ভাষা শাণিত হবে, ভাষা চতুর হবে, অথচ ভাষা স্পষ্ট হবে এবং ভাষা আমাকে আমার বক্তব্যের সারাৎসার বলতে সাহায্য করবে : প্রমথ চৌধুরীর গদ্য থেকে আহৃত এই মহৎ গুণগুলি বর্তেছিল ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায়। খুবই আধুনিক ভাষা, পরিচ্ছন্ন ভাষা, কোনো কালোয়াতি নেই, এবং পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ যে-এক ধরনের পরীক্ষায় কিছুদিনের জন্য রত হয়েছিলেন—সংস্কৃতের সংলগ্নতা—তা-ও নেই। সোজা ভাবে ব'লে যাচ্ছি, খুবই

চাতুর্যের সঙ্গে বলছি, অথচ বুঝতে অসুবিধে হয় না ; আমার যাঁরা লক্ষ্য, যাঁদের উদ্দেশ ক'রে বলছি, তাঁরা বুঝতে পারছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায় এমন-এক অন্তর্নিহিত গাঁথুনি ছিল যে মনে হয় সোজাসুজি কথা বলছেন, অথচ এই সোজা ক'রে বলবার পিছনে অনেক অনুশীলন কাজ করেছে, একটি সংস্কৃত মন কাজ করেছে, একজন সংস্কৃত সাহিত্যিক নিজেকে নিবিষ্ট ক'রে লক্ষ্যে নিবদ্ধ রেখেছেন। পড়ছি, কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না। পড়ছি, ভালো লাগছে কারণ আধুনিক ধরন। কিন্তু খুব বেশি পণ্ডিতিপনাও নেই। তার মানে এই নয় যে ধূর্জটিপ্রসাদ পণ্ডিতিপনা অপছন্দ করতেন। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁরা জানেন যে তাঁর এক ধরনের শিশুসুলভ মনোবৃত্তি ছিল। নিষ্পাপ শিশুসুলভ মনোবৃত্তি : আমি এত-এত বই ঘাঁটছি, এত-এত লেখা পড়ছি, এত নানা বিষয় নিয়ে ভাবছি—দর্শনসাহিত্যসমাজতত্ত্বসংগীতঅর্থনীতি-রাজনীতি—এই এতগুলো ব্যাপার যে আমি জানি, এতগুলো ব্যাপার নিয়ে যে আমি চর্চা করি, অন্যকে সেটাই একটু সুন্দর ক'রে বলবো। তা-ই ধূর্জটিপ্রসাদ বলতেন, তাঁর আলাপের মধ্য দিয়ে, আড্ডার ভিতর দিয়ে, তাঁর লেখার মধ্য দিয়েও ব্যাপারটি ফুটে বেরুতো : কথাপ্রসঙ্গে বাঘা-বাঘা লেখকদের নাম জুড়ে দিলেন, অনেক তত্ত্বকথা উল্লেখ করলেন, এইরকম। সংগীতের শাস্ত্র নিয়ে প্রচুর চর্চা করতেন তিনি ; রবীন্দ্রনাথ খুব ভয়ে-ভয়ে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের গানে রক্তমাংসের যে তিন-চারজন মানুষের উল্লেখ আছে, ধূর্জটিপ্রসাদ সেই তিন-চারজনের একজন : 'আমরা শুধু ভয়ে মরি ধূর্জটিদাদার'। এখন এই যে এই ব্যাপারগুলো উনি করতেন, একটু লোকদেখানো ব্যাপার, তা কিন্তু খুব নিষ্পাপ ছিল, কোনো অহংকারবোধ ছিল না তাঁর। অন্যকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার কোনো আসক্তি ছিল না, কিন্তু সাধারণভাবে এক ধরনের দুর্বলতা যে লোকগুলো জানুক যে আমি এত-এত করার চেষ্টা করছি! সমস্ত লেখাতেই চাতুর্য ছিল, প্রাখর্য ছিল, কিন্তু অহমিকা ছিল না, অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্য ছিল না, অবমাননা ছিল না, অবহেলা ছিল না।

প্রবন্ধ লেখার সে-ধারাটি বাংলা সাহিত্যে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। প্রচুর প্রবন্ধ হয় তো লেখা হচ্ছে, কিন্তু বড়ো বেশি পৌনঃপুনিক মনে হয় ; একজনেরটা দেখে অন্যজন যেন লিখছেন, ভাষাতে একধরনের প্রকট পাণ্ডিত্য যেন বহু চিন্তা-ভাবনার কসরৎ ক'রেই কথাগুলো বসানো হচ্ছে : এই কঠিন-কঠিন কথাগুলো যে ব্যবহার করলাম, এই কঠিন-কঠিন তত্ত্বগুলোর যে উল্লেখ করলাম, তাতে

লোকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তত্ত্বের উল্লেখ ধূর্জটিপ্রসাদের লেখায় ছিল, নামের উল্লেখ ছিল—পণ্ডিতি নামের—, পণ্ডিতি ছিল—কিন্তু পণ্ডিতিটি এত ধ্রুপদী সাজে আসতো না, শাদামাটা সাজে আসতো, এবং সেই পণ্ডিতি আমাদের অন্তত জ্বালা ধরিতে দিতো না।

আমার সব শেষের প্রসঙ্গ : সাহিত্যের জন্য সংগঠন প্রয়োজন। সংগঠন বাদ দিয়ে যেমন আন্দোলন হয় না, যে-কোনো আন্দোলন—রাজনীতি থেকে শুরু ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের-কলেজের কোঁদল—সংগঠন ছাড়া সাহিত্যেও হয় না। কোনো বিশেষ সাহিত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে গেলে কিছু-কিছু পারস্পরিক অনুকম্পায়ী মানুষকে একত্র করতে হয়। এখন এটা স্পষ্ট, এই একত্র করার ব্যাপারে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কত বড়ো ভূমিকা ছিলো। 'সবুজপত্র'র পর্যায়ে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে অবশ্য অনুসরণ করতেন, শিষ্যদের একজন ছিলেন। কিন্তু তার পর যতগুলো সাহিত্য-আন্দোলন বাংলায় বা বাংলার বাইরে, বিশের দশকের শেষ থেকে শুরু ক'রে চল্লিশের দশকের শেষ পর্যন্ত, জড়ো করার চেষ্টা হয়েছে, ধূর্জটিপ্রসাদের প্রত্যক্ষ না হ'লেও অন্তত পরোক্ষ উৎসাহ ও ভূমিকা প্রচুর পরিমাণে ছিল। শুধু 'পরিচয়' পত্রিকার কথাই বলছি না। কাশী থেকে 'উত্তরা' পত্রিকা বের করতেন সুরেশ চক্রবর্তী মশাই ; প্রচুর উৎসাহ পেয়েছেন ধূর্জটি-প্রসাদের কাছ থেকে। শুধু নিজের লেখা দিয়ে নয়, লেখা সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার ব্যাপারেও। অতুলপ্রসাদ সেনকে ধ'রে লেখানো 'উত্তরা'র জন্য—তা-ও ধূর্জটি-প্রসাদ করেছিলেন। প্রথমদিকের 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র জন্যও প্রচুর উপদেশ-পরামর্শ উপদেশ দিয়েছেন। অজস্র উপদেশ বিলোতেন তিনি, কিন্তু সে-সব উপদেশ নির্বিষ ছিল। এমনকি বুদ্ধদেব বসুকেও দিয়েছেন কী ক'রে 'কবিতা' পত্রিকা আরো চমৎকার করা যায়। নিজে অবশ্য প্রকাশ্যে বলতেন, কবিতা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না, কবিতা মানেই ন্যাকামো, অথচ কবিতা পড়তে ভালোবাসতেন। কবিতা-পড়া যে বিশুদ্ধ ন্যাকামো সেটা রঙ্গ ক'রেই বলতেন। বলে এক ধরনের আনন্দ পেতেন : লোকেদের কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়, কতটা তাঁরা নিরুৎসাহ বোধ করেন, কিংবা তাঁর সম্বন্ধে কতটা চমকিত হয়ে ওঠেন দেখবার জন্য, ধাঁধা লাগাবার জন্য। কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা ঘাঁটলে তাঁর স্ত্রী ছায়া দেবীর অনেক কবিতা পাওয়া যাবে, যেগুলি রচিত হওয়ার ইতিহাসে ধূর্জটিপ্রসাদের উৎসাহ জড়িত। আমার নিজের সন্দেহ, যেহেতু নিজে গান ভালোবাসতেন, গানের চর্চা করতেন, মনে-মনে তাই তিনি কবিও

ছিলেন। দিলীপকুমার রায় যেমন তর্ক করেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, ধূর্জটিপ্রসাদও তেমনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দু-তিনবার কবিতার ছন্দ নিয়ে তর্ক জুড়েছেন, কয়েকটি চিঠিতে তার উল্লেখ দেখেছি।

যে-বিশেষ্যটি ওঁর সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হয় সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হিশেবে, ইংরিজিতে ব্যবহার করা হয় ফরাশি থেকে ধার ক'রে, dilettante, কোনো-একটি বিষয়ে নিবদ্ধ না থেকে অনেক বিষয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। যদি দুশো বছর পিছিয়ে চলে যাই, এই ধরনের ব্যক্তিদেরই বলা হতো রেনেশাঁসের মানুষ। কোনো বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ না থেকে জ্ঞানের পরিধি বৃত্তায়ত হচ্ছে, জ্ঞানের সব ক'টি পরিমণ্ডলকে জড়িয়ে নিজেকে বিস্তৃত করছে। যাঁরা একটু ভারিক্কি, তাঁদের আমরা বলবো রেনেশাঁসের মানুষ, আর যাঁরা একটু ঘরোয়া, যেমন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তাঁদের আমরা একটু তাচ্ছিল্য ক'রে গাল পাড়বো dilettante, বড্ডো বেশি চঞ্চল – এই মানসিকতার মধ্যেও এক ধরনের ন্যায়হীনতা কাজ করছে ব'লে আমার মনে হয়।

তা হ'লেও এটা ঠিক যে ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। যিনি সাহিত্যে-সমাজতত্ত্বে-অর্থনীতিতে-রাজনীতিতে-দর্শন নিয়ে বিশাল চর্চা করেন, তিনি সুর ও সংগীত নিয়ে চর্চা করতেও যে পারঙ্গম, এই এতগুলি পরিচয় তিনি নিজের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের মানুষ বাংলা দেশে, আপাতত বাংলা দেশ বলতে পশ্চিম বাংলাকেই বোঝাচ্ছি, এমনকি গোটা ভারতবর্ষেই, ক্রমে-ক্রমে সংখ্যায় ক'মে আসছেন। যে-ধরনের ঘটনাক্রম দেখছি তাতে, সন্দেহ হয়, হয় তো আজ থেকে দশ-পনেরো-কুড়ি বছর পরে সেই মানুষদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অপরাজিতা

একেবারে বালকবয়সে ফিরে যেতে হয়। বাড়িতে বহু বছরের বাঁধানো 'ভারতবর্ষ' ছিল, হীরে-মণি-মুক্তার চেয়েও লোভনীয়, অনেক নিভৃত দুপুরের রুদ্ধশ্বাস আবিষ্কার সেই 'ভারতবর্ষ'গুলির সঙ্গে জড়ানো। দিলীপকুমার রায়ের 'ভ্রাম্যমাণের জল্পনা', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'অভয়ের বিয়ে' ও 'তার পর', নরেন্দ্র দেবের 'পুতুল খেলা', মণীন্দ্রলাল বসুর স্বপ্ন-মাখানো গল্প 'মায়ের দিন', সুবোধ বসুর সম-অপরূপ আরেক গল্প 'রাসুর দিদি', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সালঙ্কার কঙ্কাল', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপধ্যায়ের নাটক 'লাখ টাকা', উপন্যাস 'লজ্জাবতী', গল্প 'বিষ্যুৎবারের বারবেলায়'। আরো পরে, প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহা-প্রস্থানের পথে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গমে', এমনকি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ইতি'—এবং বুদ্ধদেব বসুর 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন'।

তাছাড়া, প্রথমে রাধারাণী দত্তর, পরে রাধারাণী দেবীর, অজস্র কবিতা, এবং একটি-দুটি আশ্চর্য বিষণ্ণ-বিধুর গল্প, এত অন্তর্বেদনায়-উপচে-পড়া যে তখনো, সেই বালকবয়সেই, সন্দেহ হতো হয় তো আত্মকাহিনী পড়ছি। গল্পগুলির নাম এখন আর মনে পড়ে না, কিন্তু নিহিত কান্নার সুর এই প্রায় পঁয়তিরিশ বছর বাদেও পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি।

অথচ, সেই সঙ্গে, উল্লিখিত কান্নার একেবারে প্রতীপ, সেই 'ভারতবর্ষে'র পাতাতেই, অপরাজিতা দেবীর রাশি-রাশি কবিতা। রাধারাণী দেবীর কোনো কবিতাই এখন আর বিশেষ মনে নেই : রবীন্দ্রনাথের সম্মোহনের খুব কাছাকাছি, স্তবকের-পরে-স্তবক, এবার-পবিত্র-হয়ে-ব'সে-কবিতা-উচ্চারণ করছি অনেকটাই এই-গোছের সমারোহ। মধ্যবয়সে হঠাৎ এক সময়ে স্মৃতিতে ঢল নামে, সুতরাং লজ্জাবোধ ক'রেই বা কী হবে, রাধারাণী দেবীর কাব্য আমার আর এখন আদৌ মনে পড়ে না, কোনো পংক্তিই হঠাৎ ঝলক দিয়ে উঠে প্রেমে পোড়ায় না। কিন্তু

অপরাজিতা দেবীর কবিতার স্মৃতি এখনো সমান উজ্জ্বলতা নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ফেরে। হায়, কোথায় গেলো সে-সব ঝকঝকে কৌতুকে-ঠিকরোনো উচ্ছল পংক্তিগুলি? একটা-দুটো কবিতার কথা মনে হয়, হঠাৎ তিন-চার দশক আগেকার পৃথিবীর সঙ্গে মেলানো কোনো চিত্রকল্প তৈরি হয়ে আসে, কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও হয়তো শেষ অনুচ্ছেদে আর পৌঁছুতে পারি না, এই আক্ষেপের কোনো তুলনা নেই। সেই 'ভারতবর্ষে'র বাঁধানো খণ্ডগুলি বহুদিন হারিয়ে গেছে, অপরাজিতা দেবীর বইগুলিও বাজারে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন শুধু থেমে-থেমে, থেকে-থেকে, স্মৃতিচারণ: একটি-দুটি পংক্তি, যা-যা মনে আনতে পারি, জিভের ডগায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চাখা, কৌতুকের ঈষৎ-ক্ষিপ্র কণিকার নির্ভরে আরো-একবার শৈশবের স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাওয়া।

অপরাজিতা দেবী অমন ক'রে মন কেড়েছিলেন তার বড়ো কারণ, ছন্দের ঝিকিমিকি বাদ দিলেও, ভঙ্গির সারল্য। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে অন্য যে-কারো কবিতার—অর্থ না বুঝেও স্রেফ শব্দের সম্মোহনে যে-সব কবিতা আগাগোড়া মুখস্থ ছিল তখন, মাইলের-পর-মাইল হেঁটে গিয়েও যে-সব কবিতার স্তবক-পংক্তি ফুরিয়ে আসতো না—মস্ত আর্ষ ভাব, মায় রাধারাণী দেবীর কবিতায় পর্যন্ত। গম্ভীর নির্ঘোষ, কবিতায় প্রবেশ করলেই যেন হঠাৎ সুদূরে উঠে যাওয়া, যেন কেউ শূন্যে উপস্থাপন ক'রে দিলেন। প্রকৃতির পরিবর্তন, পরিবেশের কেমন অন্যরকম, সংস্কৃত-সংস্কৃত হয়ে যাওয়া: এমনকি, অন্যদের প্রেমের কবিতাতেও পর্যন্ত এই গাম্ভীর্যের বাণী। ঐ বালকবয়সে যা সম্ভ্রম উদ্রেক করতো, কিন্তু কাছে টেনে নিয়ে যা অন্তরঙ্গ আলাপ জমাতে পারতো না।

অপরাজিতা দেবী একেবারে আলাদা। ঘরোয়া কথাবার্তা, শাদামাটা শব্দচয়ন, তাছাড়া পয়ারের মাপ মেনে নিয়েও ছড়ার ছন্দের ঝিলিক, প্রবহমানতার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ছেলে-ভুলোনো ছড়ার উচ্ছলতাও, বাংলা কাব্যব্যাকরণের নিগড়ও অনুপস্থিত নয়। একেবারে সাহজিকতায় নেমে আসা, আমাদের সংসারের দৈনন্দিনতার মধ্যে যে-হাসিআনন্দকৌতুকের ফুলঝুরি, সেই ফুলঝুরিকে পদ্যে সাজানো। বাঙালি কৌতুক, কিন্তু নাগরিক। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা দেশ, কলকাতা শহর, কল্পনা করুন যেন ভবানীপুর পাড়া, টাউনশেণ্ড রোড কিংবা ঐ ধরনের কোনো রাস্তা, দুপুরে যেখানে স্তব্ধতা নামে, ট্রাম লাইন থেকে দূরে, একটা-দুটো রিকশার টুংটাং, অপরিমিত মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত শান্তি। অপরাজিতা দেবীর কবিতার পরিমণ্ডল সচ্ছলতা-

জড়ানো, গার্হস্থ্যের পরিতৃপ্তি প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এমন-এক পৃথিবী যেখানে শুধুই ক্ষণিক অভিমানহেতু গালে সামান্য টোল পড়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই মেঘ কেটে যায়, আনন্দ উপচে ওঠে। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ঠিক অনুরূপ পরিমণ্ডল ছিল; ব্যঙ্গের মধ্যে কোনো হুল নেই, একে-ওকে-তাকে নিয়ে যদিও বা রঙ্গ করা, সেই রঙ্গের শেষে মুঠো-মুঠো আনন্দ অনাবিল উপভোগ।

মানছি, অপরাজিতা দেবীর সেই খণ্ডিত, সীমিত পৃথিবীতে অনেক ফাঁক ছিল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স ঠিক যখন একটার-পর-একটা অপরাজিতা দেবীর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ক'রে যাচ্ছিলেন, তখন পাট-ধানের দাম হু-হু ক'রে পতনশীল, বাংলা দেশের চাষীদের মধ্যে হাহাকার, জগৎ জুড়ে আর্থিক সংকট। যে-মধ্যবিত্তউচ্চমধ্যবিত্তদের ঘরোয়া সমস্যাদির হাল্কা দিক নিয়ে অপরাজিতা দেবী পদ্য ফেঁদে যাচ্ছিলেন, সেরকম অনেক পরিবারের ছেলেমেয়েরা তখন বাংলা দেশে সন্ত্রাসে দীক্ষা নিয়েছে, নতুন সমাজের স্বপ্ন, অস্পষ্ট বিভাসে হ'লেও, দেখতে শুরু করেছে, ইতিমধ্যেই ইতস্তত অনেক গোলাবারুদপিস্তলের শব্দ, আইন-অমান্য আন্দোলনের উতরোল ঢেউ, আন্দামানে ক্রমবর্ধমান রাজবন্দীদের সংখ্যা। অপরাজিতা দেবীর কাব্যে বাইরের এই উথালপাথাল ঝড়বাদলের অবশ্যই এমনকি পরোক্ষ ছায়াও নেই।

মানছি, কিন্তু এই আপাতস্খলন আমাকে বিচলিত করে না, গত পঁয়তিরিশ বছর ধ'রে আহৃত জ্ঞানের ভারাতুরতা সত্ত্বেও করে না। কেউ-কেউ হয় তো গাল পাড়বেন, পলাতকধর্মী কবিতা, মিষ্টি-মিষ্টি, রিনিরিনি, চটুল কবিতা, ঠুন্‌কো, শ্রেণীদেশচ্যুত, টেঁকবার নয়। এই শেষের ব্যাপারটি নিয়ে আমার আপাতত কোনো মাথাব্যথা নেই, কারণ যে-আনন্দ সেই কিশোরবয়সে পেয়েছিলাম তার তুলনা নেই, সেই আনন্দের স্মৃতিচারণে এখনো এক অভিভূত শিহরণ। একপেশে রচনা, এই তিনযুগ বাদে সেরকম অভিযোগ করারও বিশেষ অর্থ নেই। যাঁর যা বিশ্বাসের, অভিজ্ঞতার স্থলভূমি, তাঁকে তা সর্বাগ্রে মঞ্জুর ক'রে দিতে হয়। পরবর্তী কালে সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়রা বিপ্লবকে সোচ্চার ঘোষণা ক'রে কবিতা লিখেছেন, অথবা অপরাজিতা দেবীর আগে রবীন্দ্রনাথ বের্গসীঁয় দর্শনে নিজেকে সম্পৃক্ত ক'রে নিয়ে প্রগাঢ়-গম্ভীর কাব্য সঞ্চার করেছেন, এই উভবিধ তথ্যই অপরাজিতা দেবীর ক্ষেত্রে উহ্য। নিজের পৃথিবীর পরিধির মধ্যে স্থিত থেকে পরিপার্শ্বকে ভালো-লাগা, ভালোবাসা:

কেউ যদি স্রেফ এইটুকুই শুধু করেন, প্রতিভাকে শুধু ঐ খণ্ডিত, সীমিত পৃথিবীর কলকাকলির অনুলিপিতেই শুধু নিয়োগ করেন, আমি বলবো তা-ও সমান নিখাদ, সমান শিব। যত দক্ষতার সঙ্গে অপরাজিতা দেবী তা করতে পেরেছিলেন, তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই পারেননি।

এবার আরো-একটু স্পর্ধিত উক্তি করছি। কবিত্ব আসলে কল্পনাকে আঁকিবুকি খেলতে শেখানো। দেশোদ্ধার, সমাজবিপ্লবের ব্রতধারণ, এ-সমস্তও কল্পনারই উৎকীর্ণ প্রকাশ। যাঁরা সমাজের-দেশের কাজ করেন, তাঁদের সাহসী হ'তে হয়; কবিকেও সাহসী হ'তে হয়। এবং সাহস আসে কল্পনাকে বিস্ফারিত করবার প্রতিভা থেকে, যে-প্রতিভা অনেকটাই ঐশী। কারো-কারো মধ্যে প্রতিভা লুকিয়ে থাকে, কারো-কারো ক্ষেত্রে তা দীপ্তিতে উদ্ভাসিত-বিচ্ছুরিত। স্থান-কাল-পরিবেশের প্রভাবে, অপরাজিতা দেবীর কাব্যে যে-বিশেষ বিষয়ের ছায়া পড়েছিল, আমাদের হালের চিন্তাপরিপার্শ্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি না ব'লে তাকে তাই তুয়ো দেবো না, শুধু বলবো আজ আমাদের সমস্যা অন্য, কবিতার সমস্যাও অন্য, এমনকি প্রেমের কবিতার সমস্যাও।

কিন্তু তাই ব'লে আমার শৈশবের-কৈশোরের ভালো-লাগাকে আমি অস্বীকার করবো না; অস্বীকার করা মানেই নিজের সত্তার খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া। আজ আমি যেখানেই পৌঁছুই, এটা কী ক'রে ভুলি একদা, কল্পনার প্রথম উন্মেষে, অপরাজিতা দেবীর কবিতার দোলায় উন্মোথিত হয়েছিলাম? যে-কোনো বাঙালি ছেলে ইস্কুলের কয়েক বছর কবিতা মক্সো ক'রে থাকে, কী ক'রে ভুলি আমার প্রথম মক্সো-করা কবিতা রবীন্দ্রনাথের উপর দাগা-বুলোনো নয়, সতেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের প্রায়-অনুলিখনও নয়, আমার মক্সো-করা আদি কবিতা অপরাজিতা দেবীর ঢঙ নকল ক'রে?

মূঢ় ছিলাম তখন, জানতুম না রাধারাণী দেবীর সঙ্গে অপরাজিতা দেবীর কী সম্পর্ক; অ-প-রা-জি-তা এই পাঁচ বর্ণের আড়ালে পাঁচ-পাঁচটি বিভিন্ন নামের আসল কবি কেউ-কেউ লুকিয়ে আছেন কিনা তা নিয়েও তখন অনেক অলস গবেষণা চলেছে। পরে জেনেছি পুরো জিনিশটিই উজ্জ্বল কৌতুক: এই কৌতুকবিতরণকারিণীকে, এই এত বছর বাদে, সন্নত, সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থবোধ করছি।

দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা

এসেছি, গেছি। আমাদের আগেও অনেকে এসেছেন, গেছেন; আমাদের পরেও। কবিভবনের দরজা উন্মুক্ত থেকেছে। সৌজন্যপৃক্ত, স্নেহশীল মানুষটি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছেন, মতান্তর ঘটলে দামাল তর্ক করেছেন, হঠাৎ কোনো কৌতুক অথবা বুদ্ধির ছটায় উচ্চকিত হাসিতে আরো কাছে টেনে নিয়েছেন। ঝগড়া করেছি, তাঁর কোনো ধারণা বা যুক্তির সমালোচনায় রূঢ় থেকে রূঢ়তর হয়ে শক্ত-শক্ত বাক্য প্রয়োগ করেছি, কিন্তু তাঁর সৌজন্যে কোনোদিন ব্যত্যয় ঘটেনি। মতের অমিলে অনেকেই হয় তো তাঁর থেকে দূরে স'রে গেছেন, কিংবা তিনি নিজে স'রে এসেছেন, তবু কারো সম্বন্ধে কখনো সামান্যতম ব্যাজোক্তি তাঁকে করতে শুনিনি। কাছে এসেছি, দূরে গেছি, বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধে আমাদের অধিকারবোধ তাই অবিচল থেকেছে।

অন্য-সমস্ত প্রসঙ্গ আপাতত উহ্য: বিশাল সময় তো পড়ে রইলো, পণ্ডিত তথা পাণ্ডিতমন্যদের জন্য বিষয়গুলি মুলতুবি থাক। সব-কিছু ছাপিয়ে, অন্য সব-কিছু চাপা দিয়ে, এই মুহূর্তে যা বার-বার মনে আসছে, তা, তাঁকে যারা কাছে থেকে না দেখেছেন, তাঁদের ব'লে বোঝানো যায় না: তাঁর নিষ্ঠা। এমন নিষ্ঠার উদাহরণ আর কোথায় খুঁজে পাবো? বুদ্ধদেব বসুর সমকালীন, অথচ সৃষ্টির চরিত্রের বিচারে পুরোপুরি আলাদা, বিষ্ণু দে, একদা লিখেছিলেন: কবি জানে কর্মী জানে শিল্পী জানে যেহেতু প্রেমিক তারা তাই জানে তারা দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা। বুদ্ধদেব বসু আমাদের শিখিয়ে গেলেন, আসলে আলাদা করা যায় না, কবি-কর্মী-শিল্পী আসলে এক, কবিকে সেই সঙ্গে কর্মীও হ'তে হয়, শিল্পীও হ'তে হয়। কবিতা, সাহিত্য, সৃষ্টি, এর কোনো-কিছুই তো নিছক প্রেরণার ব্যাপার নয়, শুধু কল্পনার ব্যাপারও নয়, তার অনেক-অনেক বেশি। কবিতার শরীরে জড়ানো এক আপ্রাণ কর্মপ্রয়াস। যে-কোনো সাহিত্যকর্মে বিধৃত সেই মারাত্মক

অধ্যবসায়, যা জলের মতো ঘুরে-ঘুরে জীবনানন্দের চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল, যা জ্যাবদ্ধ ধনুকের মতো সর্বদা সংহত : ভাবনাকে-আবেগকে আরো শাণিত ক'রে প্রকাশ করতে হবে, ভাষাকে সংস্কৃততর করতে হবে, একবার নয়, বহুবার, ক্ষান্তি নেই, ঘুরে-ফিরে বহুবার, কারণ কবিতা—এবং যে-কোনো অন্য সাহিত্যকর্ম—আসলে এক চিরন্তন ভাস্কর্য, এক চক্রায়ত শিল্প, এক অনবচ্ছিন্ন নির্মাণ। ভাবের সঙ্গে ভাষার আপাতদ্বন্দ্বকে কোনো নিটোল সংশ্লেষণে পৌঁছুতেই হবে। তুমি যদি প্রেমিক হও, যদি ভাষাকে ভালোবেসে থাকো, ভাবনাকে যদি ভালোবেসে থাকো, তোমার বৃত্তিকে যদি ভালোবেসে থাকো, তা হ'লে তোমাকে নিযুক্ত থাকতেই হবে, প্রতি পলে, পতি মুহূর্তে, দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাতেই সৃষ্টির আনন্দ, মানতেই হবে তোমাকে সে-কথা।

বুদ্ধদেব বসু মেনেছিলেন। নিজের জীবন দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে মেনেছিলেন। পঞ্চাশ বছর সময় জুড়ে, ঢাকার রমনা-পুরানা পল্টন থেকে শুরু ক'রে রমেশ মিত্র রোড-যোগেশ মিত্র রোডের ভবানীপুর, ভবানীপুর পেরিয়ে ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, ২০২ থেকে নাকতলা, এক যতিহীন সাধনার ইতিহাস। অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে, ছাড়িয়ে নিষ্ঠা, দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাহেতু নিষ্ঠা, লেগে-থাকা, প'ড়ে-থাকা, আবিষ্ট হয়ে থাকা ; পঞ্চাশ বছর সময় জুড়ে ভাষার সঙ্গে চিন্তার বিবাহ-অভিসার। কোনো অসতর্ক শব্দ ব্যবহার নয়, ভাষাকে শাণিত থেকে শাণিততর হ'তে হবে, ভাবনার প্রকাশে সামান্যতম শিথিলতাও ক্ষমার অযোগ্য পাপ, সুতরাং চিন্তা ও ভাষার সাযুজ্য নিয়ে দিনের-পর-দিন শ্রম, তিতিক্ষা, কর্মনিয়োজিত জীবন। উপন্যাসের গঠন নিয়ে অনুধ্যান, ছন্দের গহন সুড়ঙ্গে পথান্বেষণ, প্রবন্ধের প্রসাদগুণ নিয়ে পরীক্ষা, গল্পের আকর নিয়ে আঁকড়ে-থাকা চিন্তা, অনুবাদের বিধিবিধান নিয়ে শিরঃপীড়া, অহরহ অহরহ অহরহ। অন্য-সব প্রসঙ্গ উহ্য, বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রেমিক আর কোথায় খুঁজে পাবো ? অখণ্ড প্রেম, অবিচল প্রেম, অবিকল প্রেম : ভাষাকে ভালোবেসে, কথার, শব্দের সম্মোহনের গহনে ডুবে থেকে অর্ধ শতাব্দী জুড়ে, দিনের-পর-দিন ধ'রে, ঋতুর-পর-ঋতু ভ'রে অতিবাহন।

আমরা এসেছি, গেছি, কবিতাভবনের দরজা উন্মুক্ত থেকেছে। বুদ্ধদেব বসুর অভ্যর্থনার একমাত্র কষ্টিপাথর : যাঁরা এলেন-গেলেন, তাঁরা শঠ না প্রেমিক, তাঁরা কি ভাষাকে ভালোবাসেন, শব্দের গভীরে তাঁরা কি সেই মায়াবিনীর কিঙ্কিণী শুনতে পেয়েছেন, অথবা শুনতে উৎসুক, না কি তাঁরা চতুর নাগরিক, ক্ষণিকের স্ফূর্তি লুটে তারপর চট ক'রে ছিটকে বেরিয়ে যাবার

অভিসন্ধি তাঁদের? সবাই-ই প্রেমিক না, কেউ-কেউ প্রেমিক। কিন্তু সব ক্ষেত্রে প্রথম-প্রথম ভালো ক'রে চেনা যায় না, যারা নিজেদের যথার্থই প্রেমিক ব'লে ভাবেন, তাঁদের প্রেমও অবেলায় শুকিয়ে যায়, তঞ্চক ও হঠকারীদের তো কথাই নেই। 'কবিতাভবনে' অন্য পরিচয়ের দরকার হতো না, যারা শুধু ঘোষণা করতো, তারা প্রেমিক, কবিতাকে, সাহিত্যকর্মকে তারা ভালোবাসে, তাদের জন্য দরজা খোলা থাকতো, নিষ্ঠাবান প্রেমিকোত্তম মানুষটি সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন। কেউ-কেউ সে-অভ্যর্থনার মর্যাদা রাখতে পেরেছেন, অনেকেই হয়তো পারেননি, দু'একজন হয়তো এমনকি চেষ্টা পর্যন্ত করেননি। বুদ্ধদেব বসুর বহুবার আশাভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু মোহভঙ্গ হয়নি কখনো, নিজের বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হননি কখনোই, অন্যথা 'কবিতা' পত্রিকা, হাজার কৃচ্ছ্র সত্ত্বেও, এই এতগুলি বছর ধ'রে কিছুতেই প্রকাশ করতেন না।

কবি হ'তে হ'লে, মহৎ সাহিত্যস্রষ্টা হ'তে হ'লে কর্মী হ'তে হয়: নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুদ্ধদেব বসু শিখিয়ে গেলেন সবাইকে। প্রজাপতি-পরায়ণতা নয়, এক লক্ষ্যে স্থিত থাকা, সংহত হওয়া, নিজেকে অধ্যবসায়ের নিগড়ে বাঁধা, ফেরা, অবিশ্রান্ত ফিরে যাওয়া শব্দের জন্মের রহস্যে, ছন্দের গহনে, চিন্তার নিভৃততম প্রত্যন্তে। যিনি এই তপস্যায় সিদ্ধতম, শিল্পী হিশেবে তিনি কুলোত্তম। আমাদের সমাজ ছিন্নভিন্ন, হট্টগোল-ডামাডোল-আদর্শ ভূলুণ্ঠিত, যারা শঠ আপাতত তাদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবিস্তার। এ-অবস্থায় প্রেম উপহসনীয় বস্তু, প্রায় সবাই দু'পয়সার অসাধু রঙ্গে নিমগ্ন। এই প্রতীপ পরিবেশে, প্রেমে অবিচলিত থেকে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর পুরোটা জীবন এক নিটোল উদাহরণে উত্তীর্ণ ক'রে রেখে গেলেন।

কীটদষ্ট সমাজ, ফাঁপা, নিষ্ঠায় স্থির থাকতে গেলে কতগুলি মূল্য দিতেই হয়। বুদ্ধদেব বসুও রেহাই পাননি। তাঁকেও একটা-দুটো অশ্লীল অধ্যায় পেরোতে হয়েছে, এখানে-ওখানে, সমর সেনের প্রতিধ্বনি ক'রে বলছি, জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা তাঁকে রঙিন গলিতে টেনে তোলার চেষ্টা করেছে। গ্লানিকর অধ্যায়, কিন্তু এই গ্লানির দায়ভাগ তাঁর না, সম্পূর্ণই আমাদের। যতদিন সমাজকে অন্যভাবে গ'ড়ে তুলতে নাপারবো, প্রেমকে-কর্মকে-শিল্পকে-সৃষ্টিতে সম্মান জানানোর মতো যথাযথ পরিবেশ যতদিন তৈরি নাহবে, ততদিন, বুদ্ধদেব বসু শিখিয়ে গেলেন আমাদের, কবিকে, সাহিত্যস্রষ্টাকে আমৃত্যু কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়েই যেতে হবে।

সব স্মৃতি বেঁচে থাকে না, থাকলে হয় তো তা অসহনীয় হতো। আমরা যারা একটি বিশেষ ঋতুতে কবিতাভবনে গেছি, আড্ডা দিয়েছি, তর্ক করেছি, কবিতাকে ভালোবেসেছি, ভাষাকে, শব্দকে অভিবাদন জানিয়েছি, আমাদের কাছেও এই মস্ত প্রেমিক মানুষটির অনেক স্মৃতি ক্রমশ ফিকে হয়ে আসবে। কৃতঘ্ন আমরা, তাঁর কাছে যে-স্নেহ ও প্রশ্রয় একদা পেয়েছিলাম, এমনকি হয়তো তার মূল্যও আস্তে-আস্তে কমিয়ে বলতে শিখবো। কিন্তু যে-পাপের স্খালন নেই তা যদি এমন হয় যে তাঁর জীবন যে-দ্বন্দ্বের যন্ত্রণার অখণ্ড দৃষ্টান্ত, তাকে বাজারের পসরা ভেবে বসি। দক্ষিণের হাওয়ার কাছে, উত্তরাকাশের বিদ্যুৎ-বহ্নির কাছে, নদীর তরঙ্গরোলের কানে-কানে অন্তত এটুকু যেন বলতে পারি : সেই প্রেমিক, বুদ্ধদেব বসু, তিনি জেনেছিলেন, যন্ত্রণাকে জেনেছিলেন, আগুন-বাতাস-জল সব-কিছুর মধ্যে তিনি যন্ত্রণার মাধুর্যকে দেখেছিলেন, চিনেছিলেন।

বিষণ্ণতা, আমাদের একার, মাত্র কয়েকজনের

প্রিয়বরেষু

কিরণশঙ্কর বাবু, বিষ্ণুবাবুকে নিয়ে লিখতে বলেছেন আপনি। দ্বিধাগ্রস্ত আমি, সত্যি এই মুহূর্তে কী-ই লিখবো। শেষের কয়েক বছর গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে গেলে মন খারাপ হয়ে যেত খুব। মননশক্তিহীন বিষ্ণুবাবু, সৃষ্টিকর্মের বাইরে, আলাপবিনিময়ের বাইরে। এই অবস্থা থেকে ডিসেম্বরের ম্লান সন্ধ্যায় তিনি অব্যাহতি পেলেন ; এক হিশেবে ভালোই হলো। সব-কিছু মানিয়ে নিতে হয় আমাদের, বিষ্ণুবাবুর মৃত্যুও আমাদের মানিয়ে নিতে হবে।

কাদের কথা বলছি আমি ? কাদের শোকব্যথাবিহ্বলতা ? বড়ো দ্রুত সব-কিছু পাল্টে যাচ্ছে। বাংলা সাহিত্য বলতে যে-পরিমণ্ডল আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে বোঝাতো, তা আর নেই। কবিতার ক্ষেত্রে তো মস্ত যুগ-পরিবর্তন ঘটেছে। অসংখ্য দক্ষ কবিতা লেখা হয় এখন, অসংখ্য দক্ষ কবি। রবীন্দ্রনাথে ফিরে যান সকলেই, ফিরে যেতে হয়, আমাদের ভাষামানবিভঙ্গ পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের দান, তাঁর আধুনিকতা টিঁকে আছে, থাকবে ; এটা ধ্রুপদের রূপ। জীবনানন্দ যখন কাব্যরচনা করছিলেন, তখন অনেকের মনে হয়নি, কিন্তু এখন, এই তিরিশ-চল্লিশ বছর গড়িয়ে যাওয়ার পর, তাঁকে অনেকের কাছেই খুব বেশি প্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হয়। হয়তো দ্রবীভূত হতবুদ্ধি বাঙালির হৃদয়াবেগ তথা মানসিকতা তাঁর কবিতায় যতটা প্রচ্ছন্ন, তার সমকক্ষতা অন্য-কারো কাব্যের ক্ষেত্রে নেই। তাই অসংখ্য দক্ষ কবিতার ভিড়েও জীবনানন্দ এখনো পঠিত, আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে যা অকল্পনীয় ছিল।

কিন্তু অন্য আর যাঁরা ছিলেন ? যাঁরা উদ্ধত সাহস নিয়ে, রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে, বাংলা কবিতায় নতুন স্বাদের প্রবাহ আনতে চেয়েছিলেন, সফল হয়েছিলেন ভীষণভাবে ? পেশাদার সাহিত্য-বিশ্লেষকদের বাইরে, ক'জন আর

হালে তাঁদের কবিতা পড়েন? বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-অমিয় চক্রবর্তী-সমর সেন, এই নামগুলি সকলেরই জানা, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যবসায় বা উচ্ছ্বসিত প্রেম নিয়ে তাঁদের কবিতা ক'জন আর পড়েন এখন? কবিতার সংখ্যা বেড়েছে, কবির সংখ্যা। কিন্তু, সম্ভবত সেই কারণেই, চিত সাঁতার কেটে কেউই আর তেমন রাজি নন চল্লিশ বছরের পুরোনো ঘাটে ফিরে যেতে। তিরিশ-চল্লিশ বছরে আগে যে-যে কবিতা লেখা হয়েছিল সেই সব কবিতা দীর্ণ ক'রেই সাম্প্রতিক কবিতার জন্ম; এটা শুধু ঐতিহ্যের ব্যাপার নয়, জরায়ু তথা ঔরসের সম্পর্কও। কিন্তু এই মুহূর্তে ক'জন আর মানতে রাজি হবেন তা?

সুতরাং বিষ্ণুবাবুর কাব্যমূল্যায়নের জন্য ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অনেকেই হয় তো তদ্‌সত্ত্বেও লিখবেন, লিখবেন সামাজিক কর্তব্যবশত, মৃত্যু একটি উপলক্ষ্য, এই উপলক্ষ্যে যিনি গেলেন তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে থাকি, যিনি গেলেন তিনি যেহেতু কবিপুরুষ ছিলেন, শোকবিজ্ঞপ্তির সঙ্গে তাঁর কাব্যকীর্তি সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য যোগ করা হবে। কিন্তু হালে যাঁরা কবিতা লিখছেন, যাঁরা কবিতা পড়ছেন, তাঁদের অনেকেরই কাছে বিষ্ণু দে'কে নিয়ে বাড়াবাড়ি একটু প্রক্ষিপ্ত ঠেকবে। তাঁদের এই বিচারে সততার ফাঁক নেই, সত্যিই তাঁরা বিশ্বাস করেন, হ্যাঁ, এক বৃদ্ধ কবির মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এতটা কণ্ডূয়নের কী প্রয়োজন, তেমন-কোনো মহারথী তো ছিলেন না তিনি, কী বাক্যবন্ধনে, কী ছন্দশৃঙ্খলায়, কী উপমাবিস্তারে, কী কল্পনাস্পর্ধায় আমাদের মধ্যে অনেকেই তো তাঁকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

এই শ্রদ্ধাহ্রস্বতার অনেকগুলি কারণ খতিয়ে আবিষ্কার করা যায় অবশ্য। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অভিভূত অনুকরণকারীদের পৃথিবী থেকে তিরিশের-দশকের-সেই-বিপ্লব-ঘটানো কবিদের অবস্থানে দুস্তর ব্যবধান ছিল, তার পরবর্তী অধ্যায়ে কিন্তু সে ধরনের মণ্ডলগত সমস্যা দেখা দেয়নি। গ্রহচ্যুতির ঘটনা সেই একবারই ঘটেছিল, তার পর থেকে টালমাটাল পরিস্থিতির আর আদৌ উদ্ভব হয়নি, বাংলা কবিতা, এই পঞ্চাশ বছর জুড়ে, প্রবহমানতা সত্ত্বেও, একটি বিশেষ অবৈকল্য বজায় রাখতে পেরেছে। একটু-একটু ক'রে কবিতার পরিভাষা বদলেছে, ভঙ্গিমা বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর হয়েছে, কবিতার ভাবনা কখনো সামাজিক প্রসঙ্গে আপ্লুত হয়েছে, কখনো বা ব্যক্তিগত পরিপ্রশ্নে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছে, কখনো উগ্র বহুমুখিতার দিকে তার অভিনিবেশ বিস্তৃত হয়েছে, কখনো বা গৃহজ প্রাদেশিকতায় তা ফিরে এসেছে। কিন্তু, 'কবিতা'

পত্রিকার প্রকাশারম্ভের সময় থেকে আজ পর্যন্ত, ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি। ১৯৩৫ সালে যে-কবিতা লেখা হতো, এখন, এই ১৯৮৩ সালে, তা নিশ্চয়ই অপাংক্তেয়, কিন্তু এই প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় জুড়ে যত কবিতা জন্ম নিয়েছে বাংলা ভাষায়, তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু কবিতা বৎসরানুক্রমে যদি সাজিয়ে নেওয়া হয়, কেউই বলবেন না এই শৃঙ্খলায় জৈবিক ব্যাকরণবিরোধগত দোষ ঢুকেছে। কবিতার রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু গ্রহান্তর ঘটেনি। এবং গ্রহান্তর ঘটেনি ব'লেই, উত্তরসূরীদের অনেকেরই মনে হ'তে পারে, ঐ গতবৃদ্ধদের চেয়ে আমরা নিজেরাই তো অনেক ভালো কবিতা লিখেছি, ওঁদের নিয়ে এত হৈরৈ কেন তা হ'লে? জীবনানন্দ কোনো কবিতায় মন্তব্য করেছিলেন, 'আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ হয়ে যাবে; স্বতঃসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে'। তিনি, এবং তাঁর সমকালীনরা, এটা হয়তো ভাবতেই পারেননি যে জীবনপ্রবাহের অন্য এক পরিণামও হ'তে পারে, কনিষ্ঠরাও তাঁদের জ্যেষ্ঠদের স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে ধ'রে নিয়ে অন্যমনস্ক অবহেলায় পাশে সরিয়ে রাখবেন।

ইতিহাসের 'ট্রাজিক উল্লাসে'র কথা বিষ্ণুবাবু উল্লেখ করেছেন, অথচ এটাও কিন্তু কম শোকান্তিক নয়, ইতিহাসের এই নির্দয়তা। 'দুয়ার বাহিরে যেমন চাহি রে মনে হলো যেন চিনি' থেকে 'লিলি যদি আজও ন্যাকামি করে, রোজই করে'-র প্রব্রজ্যাকে বিপ্লব ছাড়া অন্য কী বলতে পারি আমরা? ভাষা, মন, আবেগ, আবেগের অভিলক্ষ্য, বিষয় ও বিষয়ীর আপেক্ষিক সম্পর্ক ইত্যাদির বদলে যাওয়া তো সাধারণ স্তরের ব্যাপার ছিল না, পুরো কাঠামোই অন্যরকম হয়ে গেল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচর্চায় ঐতিহ্যচ্ছেদ অনেক অস্ফুট-বিনীত; বিষ্ণু দে ও সমর সেন, কিছু পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এ-ব্যাপারে আরো বহু গুণ স্পষ্ট, আত্মপ্রত্যয়শীল, স্পর্ধিত। অবশ্য যে-কোনো ক্রান্তি-মুহূর্তে যা হয়ে থাকে, কয়েক প্রহর গত হ'লে পর একজনের সাহস অপর জনকে অভয় জোগায়, পরিবেশ পাল্টে যায়, তখন কুঠারটি কে সব চেয়ে আগে হাতে তুলেছিলেন তা আলাদা ক'রে বিশ্লেষণ করা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। 'কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা' কিংবা 'শহরের বুকে পাঁচ তলায়' আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যে-বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছিল, তার স্মৃতি এখন একান্তই ব্যক্তিনিহিত, ঐতিহ্য তা গ্রাহ্যে পরিণত করেছে। বিষ্ণুবাবুকে নিয়ে আলাদা ক'রে কিছু বলতে গেলে কনিষ্ঠরা তাই অন্যত্র ব্যাপৃত হয়ে পড়েন।

তা ছাড়া এটাও বিশেষ ঋতুর নিয়ম, প্রজ্ঞা আপাতত আর কাব্যের ভূষণ নয়। হয় তো বলা হবে, বিষ্ণুবাবুর কাব্যিক বৈদগ্ধ্য এলিয়ট-পাউণ্ডের ছায়াশ্রয়ী, দেশজ মাটির প্রাণগন্ধস্পর্শ তাতে ঈষৎ সামান্য। কিন্তু পর্যায়ের পরেও তো পর্যায় থাকে, 'উর্বশী ও আর্টেমিস' পেরিয়ে বিষ্ণুবাবু, তাঁর সাহসে অবিচল থেকে, শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, সেখানে তাঁর কাব্য, এটা মনে না হয়েই পারে না, তাঁর প্রজ্ঞার সঙ্গে পূর্ণ অন্বিত। আমরা অতীতে অবগাহন করবো, ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে আহরণ করবো নতুন অভিজ্ঞান, আমাদের বাঙালি চেতনায় আঘাত হানবো চিন্তার মুদ্গর প্রয়োগ ক'রে, যে-মুদ্গরের ধাতব শক্তি সমুদ্র পেরিয়ে অন্য মহাদেশ থেকেও সংগ্রহ করবো আমরা, আমরা সমগ্র হবো, আমাদের বাঙালিত্বের সঙ্গে সর্ব বিশ্বসামগ্রীর সাযুজ্য ঘটাবো, কবিতার ভাষাও নতুন প্রত্যয়ে দীক্ষা নেবে তা হ'লে, কবিতা নতুন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করবে নতুন শৃঙ্খলা। যা হয়ে থাকে এ-সব ক্ষেত্রে, কোনো-কোনো পরীক্ষা হয় তো ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত তো এক আশ্চর্য সংশ্লেষণেই বাংলা কবিতাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিষ্ণুবাবু: কবিতাকে, এমনকি বাংলা কবিতা-কেও, সংস্কৃত হ'তে হবে, জ্ঞানঋদ্ধ হ'তে হবে, চাতুর্যের সঙ্গে, অনুকম্পার সঙ্গে, শীতলতার সঙ্গে বুদ্ধিকে, অভিজ্ঞানকে মেলাতে হবে, কোনো-কিছুই সম্ভাবনার বাইরে নয়। 'ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়। তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুক্রতমের শেষ', সহসা এই সাহসোক্তির মধ্যে এক দুর্জয় অহংকার ছিল; বুকে হাত দিয়ে বলুন সবাই, বিষ্ণু দে কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদি অহংকারের সামাজিক উপযোগিতা বিষয়ে সেই তিরিশের দশকে না শেখাতেন আমাদের, বাংলা কাব্য অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতো আজ?

মুস্কিল হলো ঘনবদ্ধ আর্থিক সংকটের পীড়নে দীর্ণ-পিষ্ট বাঙালি সমাজ, আস্তে-আস্তে নাস্তিকতায় নিপতিত হচ্ছে, পরিবেশে ক্রমশই প্রাকৃত স্বর অনুপ্রবেশ করছে। আমরা প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা প্রায় খুইয়ে বসেছি। না কাব্যরচনা, না কাব্যউপভোগ, কোনোটির সঙ্গেই আর অধ্যয়নশীলতার সম্পর্ক মানতে রাজি নই। কারো কবিতার ভাষণে হয়তো এখনো সন্ধ্যাভাষা—এটা প্রধানত জীবনানন্দীয় প্রভাব, কিন্তু তার প্রচ্ছন্ন ব্যাকরণ এখন অনেকেরই ধাতস্থ, ভাষা তো ব্যবহার্য বস্তু, তা শাদামাটাও হ'তে পারে, জমকালো-জবড়জং হ'তে পারে, কিংবা হ'তে পারে অলংকারখচিত শব্দের কিঙ্কিণী। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে

এটাও হয়, ভাষা, তার মণিমুক্তানক্ষত্রের পরিমণ্ডলের বিকিরণের মধ্য দিয়ে, সুতীক্ষ্ণ ভাবনাকে প্রকাশ করছে না, তার প্রধান ভূমিকা চিন্তাহীনতাকে কোনোক্রমে ধাঁধা লাগিয়ে আড়াল ক'রে রাখা : সময় অস্থির, কী হবে প্রজ্ঞার প্রবাহে আবগকে দীপ্যমান করে ; তার চেয়ে, এসো, প্রাকৃততর হই আমরা। স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো, বিষ্ণুবাবুর কবিতা হালে তেমন আর পঠিত হতো না ; এটা অবসন্নতার ঋতু, এটা সন্দিগ্ধতার ঋতু, ধ্রুপদী মাহাত্ম্যের প্রয়োজন নেই আর আমাদের কবিতায়, আপাতত আমাদের অন্বিষ্ট কিছু তাৎক্ষণিক গমক, কেন আর মিথ্যে আমাদের 'জন্মাষ্টমী' কিংবা 'জল দাও আমার শিকড়ে' পড়তে বলা ?

তা ছাড়া, এক মস্ত বড়ো সমস্যা তো থেকেই গেছে, দ্বন্দ্বের যন্ত্রণার কথা বহু বার বহু বিন্যাসে ব্যক্ত করেছেন বিষ্ণুবাবু, এই যন্ত্রণা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত পরম প্রশান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। জনতার সঙ্গে সাযুজ্যে উত্তীর্ণ না হ'তে পারলে কাব্যকর্ম ব্যর্থ, ইতিহাসচেতনা অপ্রাসঙ্গিক, মেধাবুদ্ধিঅধ্যয়ন অসার্থক। ধ্যানের সঙ্গে ধারণার এই মিলে-যাওয়া উন্নাসিক অনেক ব্যক্তিকে অবাক ক'রে দিয়েছিল, অবাক ক'রে দিয়েছিল হয়তো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বুদ্ধদেব বসুকে, কিন্তু বিষ্ণু দে তাতে আদৌ বিচলিত বোধ করেননি। মায়াকভস্কীর কথা মনে রেখেছিলেন তিনি, আরাগঁ তথা নেরুদার কথা, কিন্তু এটা তো অপরদেশীয় দৃষ্টান্ত থেকে চিত্তশান্তির ব্যাপারই নয়, নিজের প্রতীতি-অভিজ্ঞানের বিষয়, নিজের দেশের সংস্থানে, নিজের ইতিহাসের বিচারে, নিজের সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস বিশ্লেষণান্তে একটি নিতান্ত একান্ত প্রতীতিতে পৌঁছনো। এটা তো লুকোনোর প্রসঙ্গ নয়, গর্ব ক'রে, চিৎকৃত গরিমায় পৃথিবীকে জানাতে হবে, জনতাকে বাদ দিয়ে কবিতা হয় না, কবিতার উৎস সাধারণ মানুষ, কবিতার নির্বাণও সাধারণ মানুষের শ্রী-ও-মঙ্গলকামনাযুক্ত বেদগানে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যে-আপ্লুত আনন্দের সঙ্গে এই ঘোষণা করা চলতো, এবং যে-পরম-বিস্ময়পৃক্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তা গৃহীত হতো, তাদের ঋতু বহুকাল অবসিত। জনতা খণ্ডিত, রুশ জনতা-চীন জনতা, তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট, ভিয়েতনাম-কাম্বোজে দেখুন, জনতার আন্দোলনে কী ক্লিন্ন ভেদাভেদ। পোল্যাণ্ড-আফগানি-স্থান নিয়ে প্রাত্যহিক জল ঘোলা, শ্রমজীবী মানুষের যাত্রার পথে আত্মঘাতী নানা প্রশ্ন এসে জড়ো হয়। জনতা একদিকে জোটবদ্ধ হচ্ছে, আমাদের দেশেও হচ্ছে, শোষণের বিরুদ্ধে, জীবনের পক্ষে প্রতিদিন নতুন জটলা, নতুনতর ব্যূহ-

রচনা। কিন্তু, পাশাপাশি, প্রতীপ জিনিশও ঘটছে: দ্বিধা, সংশয়, আত্মহনন। বিষ্ণুবাবুর আত্মস্থ প্রত্যয়ের ভাষা অনেকের কাছে তাই এখন হয় তো একটু সরলীকৃত মনে হয়, একটু বেশি আবেগাশ্রয়ী, একটু বেশি গীতিকবিতা। ইতি-মধ্যে আমরা অবিশ্বাস শিখেছি, শঠতা শিখেছি, বিশ্বাসঘাতকতা শিখেছি। ইতিহাসের স্বার্থেই, এই অবস্থায়, অনেকে হয় তো বলবেন, আমাদের ইতিহাস পেরিয়ে যেতে হ'লে, এই নাস্তিক প্রহরে কী হবে আর স্তবকে-স্তবকে, পুঞ্জের-পর-পুঞ্জে পৌঁছে বিষ্ণুবাবুর কবিতা প'ড়ে?

সব শেষে যেটা বলা প্রয়োজন মনে করি, লোকপ্রেমে আচ্ছাদিত করেছিলেন নিজেকে, কিন্তু সর্বদা সতর্ক থেকেছেন, প্রথাসিদ্ধ লোকায়ত মোহ থেকে একটু আড়ালে রেখেছেন নিজেকে, তদ্‌গত, অথচ তবু নিরাসক্ত, ইতিহাসচেতনা। কণ্ঠস্বর কোনদিন উচ্চগ্রামে তোলেননি, স্পর্ধা থেকে কৌতুক, কৌতুক থেকে বোধি, বোধি থেকে উপলব্ধি, উপলব্ধি থেকে আবেগ, আবেগ থেকে আনন্দ, আনন্দ থেকে প্রশান্তি, দ্বন্দ্বের এই এতগুলি সোপান পেরিয়ে এসে বিষ্ণুবাবু তাঁর কবিতাকে এক মহৎ স্নিগ্ধতায় পৌঁছে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এই স্নিগ্ধতাকে হয় তো, এই সাম্প্রতিক সময়ে, সর্দার পোড়োদের কাছে একটু নিস্তাপ-নিরুত্তেজ মনে হতো। ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক রসিকতা এটা, রসিকতার উল্লাস।

হয় তো, আরো বেশ-কিছু বছর গড়িয়ে গেলে, যখন সমাজবিন্যাস একটু অন্য চেহারা নেবে, চিন্তায় নতুন পলির প্রলেপ পড়বে, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রবাহমানতা উজ্জ্বল এক নদীর বাঁকে পৌঁছে হঠাৎ ফের দ্বিধাথরোথরো হবে, তখন এক বন্য উৎসাহে নতুন ক'রে বিষ্ণুবাবুর কবিতা পড়া শুরু হবে আমাদের বাংলা দেশেই। কিন্তু আপনি-আমি, আমাদের পঞ্চাশ-চল্লিশ বছরের স্মৃতির এই ভারগ্রস্ততা, সব-কিছু অপসৃত হবে তখন, সংজ্ঞা আনকোরা আলাদা, বিচার অভিনব পদ্ধতিযুক্ত, ইতিহাসকে পিষ্ট ক'রে অন্য ইতিহাস দিগ্বিজয়ী ঘোড়-সওয়ারের মতো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে। সামনের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে অনুমান করা অসম্ভব কবে-কখন সেই বসন্তের উদ্গম-সম্ভবনা। ইতিমধ্যে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই। মেনে নেওয়া ভালো, আমাদের বিষণ্ণতা আমাদের একার, মাত্র কয়েকজনের।

'আঁধারে নীরব রাত্রির বেলাভূমি'

স্ফটিক প্রাসাদে বাজাবে কি কিঙ্কিণী
স্ফটিকস্বচ্ছ দিনে ?

আজ থেকে, হয় তো পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, কোথায় পড়েছিলাম এই কবিতা ?

কুসুমের পথ চিন্তাভস্মেতে শেষ,
কুসুমস্বপ্ন তবু তো দিয়েছো তুমি ;
বৈকালী মেঘে দিনগুলি মুছে গেল,
আঁধারে নীরব রাত্রির বনভূমি।
ঝরা বকুলের নিবিড় আলিঙ্গনে
কুসুমস্বপ্ন তবু তো দিয়েছো তুমি।

কোথায় পড়েছিলাম ? হয় তো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' পত্রিকায়, যে-রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলার একই গ্রামোদ্ভূত হবার সুবাদে, কামাক্ষীপ্রসাদের জ্ঞাতিসম্পর্কীয় গুরুজন ছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত প্রসঙ্গটি তো নিছক আকস্মিকতা। মফস্বলের ভোঁতা ছেলে আমি, এই কবিতাভুক্ত শব্দস্তবকগুলি তাদের মধুরিমা নিয়ে সারা দিন আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো। বাংলা ভাষার যা প্রধান আকর্ষণ-বিকর্ষণ, কানে-কানে, মৃদুতার সঙ্গে, প্রায় ঘুমপাড়ানি গানের মতো, সুখশ্রাব্য শব্দের সম্ভার, যা কাউকে-কাউকে, বিশেষবয়সী কাউকে-কাউকে, কাছে টানে, অথবা দূরে ঠেলে দেয়। আপাতত নিহিতার্থ নিয়ে বিচলিত হবার ব্যাপার নেই, শব্দের সম্মোহন, অথবা শব্দের প্রতি অনীহা। কিংবা সম্ভবত ভুল বলছি, শব্দের সমাচ্ছন্ন গাঁথুনির সঙ্গে জড়ানো যে-রোমান্টিক মানসিকতা, তা-ও হয় তো, পাশাপাশি, অবচেতনায় প্রভাব ফেলে, আমরা আরো কাছে আসি, নয় তো দূরে যাই। মফস্বলের হাবা ছেলে আমি, আমার যে-বয়স ছিল, সেই বয়সেরও ঘোর ছিল নিশ্চয়ই, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমাকে চমকে

দিয়েছিলেন। তা হ'লে বাংলা ভাষার মধ্যবর্তিতায়, আমাদের কবিতার মধ্য-বর্তিতায়, শব্দের এমন জাদু জড়ো করানো যায়, মধুরিমাকে এমন লাইনের-পর-লাইন জুড়ে, স্তবকে-স্তবকে, সাজানো যায়, যে-শব্দগুলি কানে-কানে কথা বলে, মৃদু, সংগীতময়, এত কোমলতা তাতে ? মধুরিমা, আমাকে-প্রথম-নাগরিকতায়-দীক্ষিত-করেছিলেন যে-সুরঞ্জন সরকার তাঁর নিজের পরিভাষায় যাকে আখ্যা দিয়েছিলেন, মেয়েলিমা, মফস্বলের ভোঁতা ছেলেকে যা প্রেমাবিষ্ট করেছিল।

অথচ, প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত হবার উপক্রম তাঁর মৃত্যুর পর, ক'জন আর মনে রেখেছেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে ? 'আঁধারে নীরব রাত্রির বনভূমি'। না কি, 'আঁধারে নীরব রাত্রির বেলাভূমি' ? বর্তমানের বোদ্ধাদের, ভোক্তাদের জিজ্ঞেস করুন ; তাঁরা বলবেন, কিছু যায় আসে না। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি নগণ্য নাম ; যতই দিন যাবে, নগণ্যতর হবে সেই নাম, স্থানসংকুলানের অভাবে, তার পর একদিন, সেই নাম বিলীন হয়ে যাবে।

আমার কৈশোরকে তাই আমি একটু কথা বলতে দিতে চাই। তিরিশের দশকের শেষ দিক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনো বাধেনি কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে বাধবে। বাংলা সাহিত্যের প্রকোষ্ঠে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একটি দীপ্যমান পুরুষ। বি. এ. পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম হয়ে বঙ্কিম না কী-একটা পুরস্কার পেয়েছেন কামাক্ষীপ্রসাদ, শিশুকিশোর সাহিত্যে নাম কিনছেন গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখে, 'শিশুসাথী'-'মৌচাক'-'রামধনু' জুড়ে তাঁর লেখা, কোনো-কোনো পত্রিকায়, তাঁর রচনার সঙ্গে, প্রথম পৃষ্ঠার উপরের বাঁ কোণে, পাসপোর্ট-আকারের মুখাবয়ব ছাপা হচ্ছে কামাক্ষীপ্রসাদের। শিশুকিশোরদের কাছে সে-রচনার স্বাদ একটু আলাদা, তাতে ভালোমানুষি আছে, অথচ ভালোমানুষির সঙ্গে আছে একটি ঝকঝকে ভাব, উজ্জ্বলতা। সেই তিরিশের দশকের শেষের দিকে, উজ্জ্বলতার প্রতীক হিশেবে ছিলেন কামাক্ষীপ্রসাদ আমাদের কাছে।

'প্রবাসী' থেকে 'কবিতা' পত্রিকায় উত্তরণ করতে তেমন-বেশি সময় লাগেনি কামাক্ষীপ্রসাদের, উজ্জ্বলতার সঙ্গে মেশানো রোমান্টিক এক ঘোর। সমর সেন, কামাক্ষীপ্রসাদ, কামাক্ষীপ্রসাদের সহোদর দেবীপ্রসাদ, পরস্পরের প্রগাঢ় বন্ধু ছিলেন তখন, কবিতা-লেখা তৎকালীন বন্ধুদের প্রায় ধর্মীয় কর্তব্য ছিল, অন্য যা-ই করুন না কেন, সময় উত্তাল-উদ্‌ভ্রান্ত, কবিতায় প্রবেশ করতেই হবে। অথচ, 'কবিতা'র পুরোনো সংখ্যাগুলি, কিংবা সে-সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যপুস্তকগুলি, নেড়ে-চেড়ে দেখুন, সমর সেনের কবিতার সঙ্গে

কামাক্ষীপ্রসাদের কবিতার কী দুস্তর ব্যবধান। উজ্জ্বলতা আছে, চাতুর্য আছে, অকস্মাৎ এমনকি সমর সেন-সুলভ নিখাদ বিষণ্ণতা পর্যন্ত আছে, যে-বিষাদ নাস্তিকতার অধিক, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ রোমান্টিকতায় প্রত্যাবৃত, ঘুরে-ফিরে একটি মিষ্টি, মৃদু স্বর, পরিবেশের চতুরালিকে ছাপিয়ে সেই অস্ফুট গোপনচারিতা :

> সায়াহ্নের স্তব্ধতায় আমি রিক্ত, উদ্দাম তবুও
> মনে-মনে কথা বলি, ব্যর্থতার গৌরবের গান···
> এখানে ফুটেছে ফুল গন্ধে বর্ণে রঙিন আলোতে
> উপরে আকাশ আছে নীল স্তব্ধ সমুদ্রের মতো,
> আমার কামনা দিয়ে আমিই কি রাঙাবো তাদের ?
> সন্ধ্যার নদীর তীরে অন্ধকার আসন্ন উদ্যত··· ।

আজ যখন চল্লিশ বছরের ভারাক্রান্ত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথর সঙ্গে নিয়ে এই পংক্তিগুলিতে ফিরে যাই, রূঢ় সমালোচককে প্রত্যুত্তর দিতে পারি না, মানতেই হয়, কামাক্ষীপ্রসাদের কবিতায় কোমলতার শরীরে কোনোদিন দার্ঢ্য অনুপ্রবেশ করেনি, তাঁর কবিতা তাই কথার উপর কথা, কাকলির পাশে কাকলি হয়ে থাকে, বিষণ্ণ মাধুর্যের বাইরে তাদের আর অন্য-কোনো পরিচর্যার দায়ভার নেই, কোনো দর্শনে পৌঁছয় না তারা, আমাদের স্মৃতির বাইরে তাদের স্বপ্রতিষ্ঠ হবার মতো কোনো নিখাদ বৈশিষ্ট্য নেই। কামাক্ষীপ্রসাদের কবিতা তাই, আমাদের মতো মাত্র কয়েকজনই, যারা সেই তিরিশের দশকের শেষের দিকে অন্য পরিষঙ্গ হাৎড়ে ফিরছিল, মনে-মনে আওড়ে বেড়াবে, হঠাৎ কোনো বর্ষাম্লান সন্ধ্যায়, বাসের ভিড়ে, ছেড়ে-যাওয়া স্টেশনের বিলুপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মুহূর্তে।

এখানেই ইতি টানা তা হ'লে ? কিন্তু, অন্তত একবার, কামাক্ষীপ্রসাদের 'এস্প্লানেড' কবিতাটির কথা ভাবুন। বাংলা কাব্যে একটি নতুন বিভঙ্গের চেষ্টা করেছিলেন কামাক্ষীপ্রসাদ। যে-গদ্যে কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত মানুষ, আজ থেকে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে, নিজেদের প্রকাশ করতো, সেই গদ্যের সঙ্গে কবিতাকে মেলানো যায় কিনা, পয়ার ভেঙে, অথচ মিল বজায় রেখে, কবিতা অথচ কবিতা নয়, কবিতা নয় অথচ কবিতা :

> এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে পারেন
> স্যার আর. এন.
> কী ক'রে বড়ো হয়েছিলেন।

সেই পরীক্ষার রণন গিয়ে ঠেকেছিল 'রাজধানীর তন্দ্রা'য় :

…"আর একটু চা ?" "নো, থ্যাঙ্কস্।"
"ডেভিকোয়, সাড়ে আটটায় ?"
"আমেরিকানরা সভ্য, দেখেছেন টমিরা কিরকম তাকায় ?"
পিঠ-বুক-হাত-কাটা জামায়
বললেন মিসেস্ রায়।

কোনো আধুনিকাকে অভিসারের ইশারা করার মধ্যে নাগরিকতার যে-উচ্চারিত পরিমণ্ডল, তার ঈষৎ-কিছু আভাস মেলে হরপ্রসাদ মিত্রের ইতস্তত রচনায়, হাতের আঙুলে গোনা যায় এমন একজন-দু'জন আরো কারো কবিতায়। এখনো, বাক্সবন্দী কবিতার বইয়ের পাট ভেঙে, মাঝে-মাঝে লোভ হয় আমার, জিভকে হ্লাদিত করি :

হেমন্তের সূর্যভাঙা সন্ধ্যায় আলোর কুমকুমে
ক্লান্ত চোখ চম্‌কালো।
ঘুমঘুমে নেশায় নিজেকে ভালো লাগলো।
(সূর্য, তোমার এত আলো !)
…পিরামিড, গণ্ডোলা, হেলেন…
স্মৃতির কাঁথায় এলেন ঈশ্বর।
সৈনিক সময় বিশ্ব'র
বুকে সরীসৃপের মতো।
সূর্যভাঙা সন্ধ্যায় আলোর কুমকুম তবু তো।

অথচ, স্বীকার করতেই হয়, কামাক্ষীপ্রসাদের প্রয়াস আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো না, ব্যাপকতা পেল না, একক চাতুর্যে স্থিত থাকলো, এখন ধুলো ঝেড়ে পড়তে হয় কৌতুকেব্যঙ্গেপ্রসন্নআনন্দে ছড়িয়ে-দেওয়া ছিটিয়ে-দেওয়া সেই কবিতাগুলি :

লেড়কী লৌটকে এলো
ফুর্তিসে বাবু আউর লেড়কা
দোসরা-দোসরা মহলমে বহুৎ মদ খেলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, গুলি, গ্রেপ্তার, স্বাধীনতা-আসবে-কি-আসবে-না, বাংলা কাব্যে-সাহিত্যে প্রতীক হিশেবে কয়েকটি নাম, যে-নামগুলি বিষ্ণু দে-বুদ্ধদেব বসু-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-অমিয় চক্রবর্তী-জীবনানন্দ দাশের উত্তরসূরি, সমর সেন-চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়-কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়-

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কারো সঙ্গে কারো হয় তো রচনার লক্ষণে-মানসিকতায়-জীবনদর্শনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মিল নেই, কিন্তু সামগ্রিক ঝোঁকের একটি বিশেষ আদল। কামাক্ষীপ্রসাদরা 'কবিতাভবনে' আড্ডা দিচ্ছেন, সুন্দরী মহিলাদের অভিভূত করছেন, কখনো মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকছেন, সেই সঙ্গে চকচকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবছেন, যার নাম 'সংকেত', যে-সূত্রে প্রকাশসংস্থার নামকরণ 'সংকেতভবন', যুদ্ধকালীন কাগজসংকটের জন্য যে-পত্রিকা একটি-দু'টি সংখ্যা বেরিয়েই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কামাক্ষীপ্রসাদের উদ্দীপনায় ভাঁটা নেই, বের করলেন ছোটোদের জন্য চকচকেতর পত্রিকা, 'রংমশাল', যে-পত্রিকাকাহিনী বুদ্ধদেব বসুর ছড়ায় বিধৃত হয়ে আছে :

> রংমশালের সম্পাদকের চম্পাবরণ কন্যা
> সমস্ত তাঁর ভালো
> ঘর করেছেন আলো
> দোষের মধ্যে একটি শুধু
> রাত্তিরে ঘুমোন না।

কবিতায় কথিত গদ্য নিয়ে অনুশীলন, অথচ, না কি অনুরূপ কারণেই, কামাক্ষী-প্রসাদের একটি-দু'টি গল্প, যা ঐ একই সময়ে লেখা হয়েছিল, কবিতার সম্মোহনে ঢাকা :

> এই কি সেই মুখ, এই কি সেই মুখ যা ভাসিয়েছিল হাজার জাহাজ, পুড়িয়েছিল ট্রয়ের প্রাসাদগুলি, জাফরানি আর চাঁপা রঙের আশ্চর্য আলোয়, দেখলে বিস্ময় হয়। হয়তো এরই জন্য একদিন জাহাজের পালে লেগেছিল হাওয়া, পুড়েছিল ট্রয়। কিন্তু সেই আশ্চর্য আলোর পরের মুহূর্তে যে দাঁড়িয়েছিল তার রঙ সিসের মতো বিবর্ণ, চোখের নিচের হাড়গুলো স্পষ্ট, গালের উপর কয়েকটি রেখা···

যে-কোনো মানুষেরই অন্তঃস্থিত প্রদাহযন্ত্রণাআকুতিগুলি বৈদেহী উচ্চারণে কথা বলে, যখন তারা বাইরে বেরোয়। অনেক ক্ষেত্রেই, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তিতায় রূপান্তরিত হয়ে বেরোয়। কামাক্ষীপ্রসাদের মধ্যেও একটি বিশেষ যন্ত্রণা ছিল, কিন্তু ক'জন আর সেই যন্ত্রণার সারাৎসার বিশ্লেষণে উৎসাহ পাবেন এই এতগুলি যোজন পেরিয়ে আসার পর ?

তিরিশ-চল্লিশ দশকের উজ্জ্বলতা কেন পঞ্চাশের দশকে হঠাৎ মুহ্যমান

স্তব্ধতায় পৌঁছলো তার অনেকতর পারিবারিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যাখ্যা সম্ভব। কামাক্ষীপ্রসাদের ব্যক্তিগত ইতিহাসে, আমি অন্তত, দেশের-কালের বিন্যাসের সঙ্গে একটি অপ্রচ্ছন্ন সমান্তরলতা দেখতে পাই। উদ্ভিন্ন যৌবনে কামাক্ষীপ্রসাদ স্থাণু মৈনাককে বীর্যবান সৈনিক হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন :

> দূর করো মন্থর মন্থরা
> মেদময় স্ফীত বৃদ্ধ জড়া,
> রক্তে জাগে পুরোনো সূর্যের ইতিহাস,
> সে কি পরিহাস ?

ভিন্‌দেশীরা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল ভারতবর্ষে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে সেই সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর কলকাতা, কলকাতার যুবসম্প্রদায় অকুতোভয় উৎসাহে সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষা-সাহিত্যলোকে প্রবেশ করেছে, অনুপ্রেরণা পেয়েছে, এই অনুপ্রেরণায় নিজেদের আপ্লুত ক'রে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের যুদ্ধগত করেছে। সেই যুদ্ধে আবেগ ছিল, স্বপ্ন ছিল, উন্মাদনা ছিল, পরীক্ষা-পরিশীলনের স্পর্ধা ছিল। সেই স্পর্ধা থেকে উচ্চকিত সাহস, অসিধারণবৃত্তি। সাহসের সহস্র বিভঙ্গ, যা, এমনকি কাব্যেসাহিত্যে পর্যন্ত, অসেতুসম্ভবকে সম্ভাবনার প্রান্তে টেনে নামায়। মুস্কিল হলো পরদেশীদের শৃঙ্খল থেকে বিমুক্ত সমাজের যে-রূপকল্প আবেগকে দুর্মর তাগিদে পরিচালনা করেছিল, স্বাধীনতা-উত্তর দেশের আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়লো। যে-কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে সকলকলাপারঙ্গম ব'লে একদা আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, স্বাধীনতাউত্তর সময়ে তাঁর মানসিক উপপ্লবের ইতিহাস আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত, অনুমানে-অনুভবে তাকে স্পষ্টতায় নিয়ে আসতে হয়। যে-চাতুর্য ছিল নিভৃত মূলধন, তা হঠাৎ বহুর সম্পদে পরিণত ; যে-কাব্যকলা ছিল ঈষৎ কয়েকজনের নিজস্ব সম্ভোগ, তা হঠাৎ রূপান্তরিত হলো জনতার জোয়ারে ; যা ছিল ব্যক্তিগত পরিভাষা, দুমড়ে-মুচড়ে-চেহারা পাল্টে তা বিস্ফারিত হলো বিরাট এক লোকাচারে ; প্রারম্ভলগ্নের যাজকদের কেউ আর মনে রাখলেন না।

হয়তো এই ব্যাখ্যায় প্রচুর অসম্পূর্ণতা। সামগ্রিক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের পারস্পরিক সম্পর্কে হয়তো আরো নানা জটিলতা ঘনবদ্ধ। নেহাৎই জৈবিক অর্থে বেঁচে থাকার তাঁর শেষের কয় বছরে কামাক্ষীপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার একটি হার্দ্য সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল। প্রায়-মৈনাকে-পরিণত সে-কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তবু যান্ত্রিক নিয়মে তখনো তিনি কাব্যসাহিত্যের চর্চা করছেন, নিজের অতীত রচনার প্রাণহীন প্রতিধ্বনি, ইতিহাস যদিও ইতিমধ্যে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। জৈবিক অর্থে বেঁচে থাকা, জৈবিক কারণে কবিতা লেখা, গল্প মক্সো করা, প্রবন্ধে হাত দেওয়া। অথচ, আমাদের মৈনাকত্বপ্রাপ্তির পরও, স্মৃতি জড়ত্বের কাছে ঠিক আত্মসমর্পণে সম্মত নয়। স্মৃতি প্রহার ক'রে বেড়াত কামাক্ষীপ্রসাদকে, তাঁর একদা-উজ্জ্বলতার স্মৃতি, যে-তুখোড়, চৌকস্ কামাক্ষীপ্রসাদ বাংলা কাব্যে ইমনকেদারাবেহাগ-বাহারের সঙ্গে অশনিসংকেত সংযোজন করবেন ব'লে একদা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, যে-কামাক্ষীপ্রসাদ নিখুঁত গল্প-কবিতা লেখার সঙ্গে নিখুঁত ছবি তোলা মেলাতে পারতেন, যে-কামাক্ষীপ্রসাদ প্রতিভাধর সম্পাদক ছিলেন, যিনি বেকারসমস্যাদীর্ণ ঔপনিবেশিকতাবোধসমাচ্ছন্ন সংকীর্ণ বাংলা দেশের পরিমণ্ডলে অহরহ একদা অপ্সরাপরিবৃত ক্যামেলট কাহিনীর মধ্যমণি হিশেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার সাহসে অবগাহন করেছিলেন।

আমাদের অন্তরঙ্গতর আড্ডায়, প্রতি রবিবার সকালবেলা, বেশ কয়েক বছর ধ'রে যাঁরা নিয়মিত অতিথি ছিলেন, অধিকাংশ নির্বাপিত পুরুষ, স্মৃতিতে-দহিত, স্মৃতিতে-বিধ্বস্ত, স্মৃতিতে-অবসন্ন, কামাক্ষীপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে প্রধান। কতিপয় নির্বাপিত, ঠিক পরাজিত নয়, কিন্তু অপসৃত, পুরুষ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই নামগুলি, এমনকি পাদটীকায়ও, টিঁকে থাকবে না, যেমন কামাক্ষীপ্রসাদের নাম ইতিমধ্যেই ধুয়ে-মুছে গেছে। 'কুসুমের পথ চিতাভস্মেতে শেষ'। কিন্তু লিখিত ইতিহাসে ইতিহাসের কতটুকু যথার্থ পরিচয়? আমার জানা নেই, যতটুকু জানা, তা পরিত্যাজ্য ব'লে মনে হয়, কারণ, শেষ পর্যন্ত, 'ঝরা বকুলের নিবিড় আলিঙ্গনে কুসুমস্বপ্ন তবু তো দিয়েছো তুমি'। কামাক্ষীপ্রসাদ বেঁচে থাকলে, এবং শুনতে পেলে, লজ্জা পেতেন, কারণ বড়ো নম্র মানুষ ছিলেন, নম্র নিঃশব্দ ভালোমানুষ।

স্মৃতির গম্বুজ

পুরোনো বন্ধুরা যত স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে। অরুণকুমার সরকার কাকে অনুযোগ করেছিলেন? আমাকেই কি?

এই তিরিশ বছরে আমার নিজের ঠিকানা অন্তত তিরিশবার বদল হয়েছে। অরুণকুমার সরকারের হয়নি। বরাবরের মতোই, এখনো ৪৫ এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৬। কিন্তু স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছি এই কলকাতাতেই, হয় না, অরুণকুমার সরকারের সঙ্গে দেখা হয় না, আদৌ হয় না, ফেরা হয় না পুরোনো আড্ডার সুখের শিহরণে। হ্যারিসন রোড-কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের লাল দালান, তেতলার অপরিসর ঘর, ১৯৪৫ সাল, যুদ্ধ হয় তো সদ্য থেমেছে কি থামেনি, অপরিসর ঘর, আড্ডা, সিগারেটের ছাই, ধোঁয়া, শাদা পেয়ালায় স্বাদু চা, রবীন্দ্রনাথের গানের টুকরো, অসংখ্য টুকরো, কবিতার অক্ষৌহিণী পংক্তি, একটু রাত ক'রে হয় তো অরুণকুমার সরকার, পকেটে হয় তো কোনো নতুন-লেখা কবিতা, নয় তো, সেই তেতলায় ঘরের এলোমেলো বিছানায় তেকোণা হয়ে ব'সে, ইলাসট্রেটেড উঈকলীর পাতার শাদা মার্জিন আচ্ছন্ন ক'রে, মার্জিন ছাপিয়ে, কিলবিল সাপের মতো কবিতার জন্ম : পৃথিবী অদ্ভুত তাই অন্ধকার হ'তে তুমি নারী, অথবা হস্তিনী মেয়ের মতো কদাকার এই পৃথিবীতে শঙ্খিনী মেয়ের মতো মালবিকা হালদারের দাঁত, না কি জীবনের সেই তো ফোয়ারা সারা রারা রারা···রাত বাড়ে, সেই অপরিসর ঘরে পরিচিত-অপরিচিত-স্বল্পপরিচিত নানাজন ঢুকছে, বেরোচ্ছে, আড্ডা কিন্তু একই গ্রামে বাঁধা থাকছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সদ্য থেমেছে কি থামবো-থামবো করছে, সমর সেন তখনো কড়া-কড়া কবিতা লিখছেন, আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি ওভারটুন হলের তেতলার ঘরে, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ধ'রে সে-ঘর ডিঙিয়ে নিচের রেস্তরাঁয়, সে-রেস্তরাঁ পেরিয়ে কাফ হাউসে, কফি হাউস থেকে উধাও হয়ে গিয়ে ময়দানের কুয়াশায় কোথায়

যেন, রেড রোড থেকে চৌরঙ্গীর মুগ্ধতার মৌতাতে স্থবির···

আমরা আড্ডা দিচ্ছি, ফিকে-হয়ে-আসা সব নাম, ফিকে-হয়ে-আসা মুখাবয়ব, কে আসছে, কে যাচ্ছে, সোমেশ আচার্য, অর্ধেন্দু হালদার, গৌরকিশোর ঘোষ, যে-গৌরকিশোর ঘোষ তখন কবিতা লিখতো, বেকার তথা বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী, অথচ উদ্ভট হাজার গল্পও বলতো সেই সঙ্গে, মেডিকেল কলেজের উল্টো-দিকে, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট না কী যেন নাম সে-রহস্যময় গলির, সে-গলির আরো গাঢ়তর রহস্যঘেরা অন্ধকার বাড়ির দুর্গম ঘরে, ইকমিক কুকারে রান্না রেঁধে মাঝে-মাঝে খাওয়াতো, গৌরের চশমার কাঁচ, বোধহয় বাঁ দিকেরটা, মাঝখান থেকে আড়াআড়ি পুরো ফাটা, তার হাসির দীপ্তি তাতে যেন উজ্জ্বলতর।

দমকা হাওয়ার মতো, অন্য আরো স্মৃতি। কালবোশেখীর বিকেল, বাজ পড়ছে, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে ; ঢাকার রমনার বিশাল প্রান্তরের এক কোণে এক প্রাচীন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করছি, পকেটে কলকাতা-থেকে-সদ্য-আসা চিঠি, পিঁপে-পিঁপে চিঠি আসতো তখন আমার মফস্বলে, অরুণকুমার সরকারেরই চিঠি, হয় তো বা সেই সঙ্গে পাঠানো টাটকা কবিতা : হে রাত্রি, মিনতি শোন, মিত্র হও, কটাক্ষ হেনো না, অথবা, লিখলুম বিচিত্রা দাশকে বহুদিন দেখিনি আকাশকে।

কিন্তু হারিয়ে যায়, বিচিত্রা দাশকে ইদানীং মনেও পড়ে না আদৌ, মাঝে-মাঝে শুধু যখন ট্রাম আচম্‌কা এলিঅট রোডে বাঁক নেয়, অথবা দু'নম্বর বাস প্রেসিডেন্সী কলেজের ম'রে-যাওয়া কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে ঠেরে এগোয়, কোথায় যেন একটা ধাক্কা লাগে। 'চতুরঙ্গ' না 'পূর্বাশা' কোন্ দপ্তরে যেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রথম আলাপ, দীর্ঘ সুঠাম শরীর, ভাষণে প্রীতি, আড্ডায় দীপ্যমান। রাত জেগে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন, পরদিন সন্ধ্যায় আমরা সবাই কফি হাউসে ঘিরে বসেছি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পড়ছেন : আর কতকাল তা হ'লে কবিতা লিখবো বলো, আর কতকাল লেখা-লেখা খেলা খেলতে বলো···। হয় না, আমরা সবাই কলকাতাতে, অথচ বাঙ্গুর এভিনিউতে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আর বলা হয় না, কবিতা প'ড়ে শোনান, নতুন-লেখা কবিতা। আমরা সবাই অন্য মানুষ।

···কফি হাউস, সবুজ দেয়াল, উত্তর-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে সবুজ বেতের চেয়ার, হঠাৎ ঝড়ের মতো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঝোলা-ভর্তি কবিতা, অথচ কফি হাউস ঠিক যেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মানাতো না, তাঁর কবিতার ক্ষেত্রভূমি তো

রাস্তায় মিছিলে। কোনোরকম আপোষ না ক'রে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্দম কবিতা, যা তাঁর সার্বিক সততার সঙ্গে পাশাপাশি এগোচ্ছে, দেশজ সাহস, দেশজ স্পষ্টবাদিতা : হে যুবক, হে যুবতী, পৃথিবীতে তোমাদের কতটুকু দাম, কান্নাকে শরীরে নিয়ে কান্নাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় ফোঁটা দিয়ে গেলে আলো ?—সেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি নির্মোহ, রূঢ়ভাষী, কিন্তু যাঁর বন্ধুবৎসলতার তুলনা নেই, তুলনা নেই যাঁর কবিতাগত সত্তার।

স্মৃতিরা হারিয়ে যায়। বন্ধুরা উধাও। গুহার অন্ধকারে ছায়া অপসৃয়মান। দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ন, ক্লান্তি, হতাশা। প্রচুর কবিতা লেখা হচ্ছে বাংলা ভাষায়। প্রচুর কবিতা লেখা হচ্ছে কলকাতায়, বাংলাদেশের মফঃস্বলে। কিন্তু, অপরাহ্নে, সব কবিতাই পুনর্লিখিত কবিতা, সব কবিতাই কেমন একাকার। স্মৃতিরাও প্রায় উধাও। এরই মধ্যে এখনো মাঝে-মাঝে একমাত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কী ক'রে যেন দেখা হয়। অবিকৃত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এখনো মিছিলে-ময়দানে তাঁকে দেখা যায়। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ বজ্রনিনাদ ক'রে ওঠে, তাঁর কাছে এখনো কবিতা জীবনের সমগ্র সংগ্রামের দ্যোতক।

বন্ধুরা উধাও, স্মৃতিরাও ক্রমশ ফিকে। রাজপথে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখে তাই ভরসা পাই, দু'কদম এগিয়ে গিয়ে হাত চেপে ধরি। অন্যান্যদের বিচারে যা মূর্খামি, নয় তো ভণ্ডামি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাতে ভালো লাগে : এ-লড়াই বাঁচার লড়াই, এ-লড়াই জিততে হবে!

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আজ এই ক্রান্তির মুহূর্তে, আমার সমস্ত বন্ধুর বিকল্প, প্রতিভূ।

হলদে প্রজাপতি

অজ মফস্বলের ছেলে ছিলাম আমি। ১৯৪৪ সাল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বাইরের পৃথিবী উতরোল, এরই মধ্যে, সেই মফস্বল শহরে, আমাদের রাজনৈতিক দীক্ষা, পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, কবিতাকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া। কপাল ভালো, কী ক'রে কলকাতা শহরে দুই বন্ধু জুটে গেল আমার। চিঠি লেখা থেকে শুরু যে-বন্ধুতার, প্রতি সপ্তাহে দুটো-তিনটে ক'রে চিঠি, কুড়ি-পঁচিশ পৃষ্ঠা-ব্যাপী চিঠি, পোস্টকার্ডের চিঠি, কোনো টাটকা-লেখা-অখণ্ড-কবিতা-খামের-ভিতর-পুরে-দেওয়া চিঠি, অথবা কোনো কবিতার টুকরো—শুরু বা শেষ—যে-চিঠিতে, কিংবা কোনো গল্পের ভূমিকা, নয়তো লঘু বা গুরু প্রবন্ধের বেশ-খানিকটা। বেশির ভাগই কবিতা, রাশি-রাশি উদ্দাম অপব্যয়ের অভিব্যক্তির মতো : লিখলুম বিচিত্রা দাশকে বহুদিন দেখিনি আকাশকে, অথবা, পৃথিবী অদ্ভুত তাই অন্ধকার হ'তে তুমি নারী, কিংবা, হে রাত্রি মিনতি শোনো, মিত্র হও, কটাক্ষ হেনো না।

তার পর, এই গোটা পঁয়তিরিশ বছর ধ'রে, অনেক উচ্চাবচতা, যাযাবর আমি, অস্থিরচিত্ত আমি, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, আপাততিতিক্ষা থেকে অন্য আপাত-তিতিক্ষায়, সতত ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি। আমার সেই দুই বন্ধু, যাঁদের কাছে আমি নাগরবৃত্তিতে প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম, সুরঞ্জন সরকার-অরুণকুমার সরকার, তাঁরা অচঞ্চল থেকে গেছেন, ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়-আনন্দে-অবসাদে-উত্থানে-অবরোহণে তাঁরা আমাকে ছায়া দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। আমাদের জাগতিক সংস্থান বরাবরই বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন বিন্দুতে। দিনের কোলাহলে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেকটা দূরে থেকেছি, কিন্তু দিনান্তে, যখন বিনিময়ের সময়, উপলব্ধির মুহূর্ত, প্রায় স্বতঃসিদ্ধতার মতো পরস্পরের কাছে চ'লে এসেছি, ফিরে গেছি ১৯৪০-৪৫ সালের অলৌকিক মহাদেশে। প্রচলিত অর্থে সুরঞ্জন

সরকার বিখ্যাত নন, কিন্তু খ্যাতি-অখ্যাতি তো সংজ্ঞার ব্যাপার, অমুকের অথবা তমুকের প্রজ্ঞার ব্যাপার। আজ থেকে তিন-চার দশক আগে কে না জানতো কলকাতা শহরের উজ্জ্বলতম, তুখোড়তম যুবকের নাম ছিল সুরঞ্জন সরকার। অরুণকুমার সরকার কবি হিশেবে খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন খানিকটা, কিন্তু বাইরের পৃথিবীর কাছে তাঁর যে-পোশাকি পরিচয়, তা, আমার কাছে অন্তত, উপহাস্য। মানবো না কোনো স্পর্ধিত উক্তি করছি, মানবো না নিছক ব্যাকরণসম্মত বন্ধু-তর্পণ করছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে-পঁয়তিরিশ বছর গড়িয়ে গেছে, স্বভাব-প্রতিভায় অরুণকুমার সরকারের কাছাকাছি আসতে পারেন এমন ক'জন কবি আছেন? হাজার-হাজার যশোপ্রার্থী, এই সাড়ে তিন-চার দশকের আয়তন অধিকার ক'রে, কবিতা রচনা ক'রে গেছেন। কিন্তু যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে কবি ক'জন? এক-আধ কুড়ি, এঁদেরই মধ্যে, যশস্বী হয়েছেন, কিন্তু আবেগ, বোধ ও শৈলীর সংহতি যদি কষ্টিপাথর হয়, তা হ'লে অরুণকুমার সরকারের কাছাকাছি ক'জন? সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পর, জোর দিয়েই কি বলা চলে না এটা, অরুণকুমার সরকারের কাছ থেকে যত স্মরণীয় পংক্তি পেয়েছি, আর-কারো কাছ থেকেই তা না? রবীন্দ্রনাথের গানের কলির মতো, আমার-আপনার-উদীয়মান যুবকের-প্রেমের-নিটোলতায়-আবিষ্ট-হয়ে-আসা যুবতীর উচ্চারণে অবচেতনার মতো, লীন-লগ্ন হয়ে থেকেছে সে-সমস্ত পংক্তি, একই সঙ্গে উজ্জ্বলতা-নিবিড়তা, চাতুর্য-বৈষণ্ণ্য, দীপ্তি-স্থৈর্য, স্বপ্নাবিলতা-বাস্তব পৃথিবীর কঠিন রূঢ়তা : বৃষ্টি ভেজা বাড়ির মতো রহস্যময় তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়, যৌবন যায় যৌবন বেদনা যে যায় না, ব্যাকুল বিকেলে বাজে স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাত সাগরের দোলানি, যতই বয়স বাড়ে ঈশ্বরের কাছাকাছি যাই, আবাদ ও মরুদেশে শুধুমাত্র রঙের তফাত, সে কোন্ নারীকে আমি ভালোবেসে ক্ষ'য়ে যেতে পারি কঠিন অসুখে ভুগে, শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে, সিন্দুক নেই স্বর্ণ আনিনি এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য, ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের পাবো কি পরশ যৎসামান্য···

উদীয়মান যুবক, প্রেমের-নিটোলতায়-আবিষ্ট-হয়ে-আসা যুবতী, তাঁরা এ-সব কবিতার উচ্চারণসাচ্ছল্য স্বতঃসিদ্ধতা হিশেবে মেনে নিয়েছেন, কী আশ্চর্য অবলীলার সঙ্গে তাঁদের কণ্ঠ থেকে, অস্ফুট অথচ ঋজু, পংক্তিগুলি নিঃসৃত হয়ে আসে। যা সমান আশ্চর্য, যাঁরা সে-সব রচনাকাহিনী জানেন, তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন, কবিতাগুলি লেখাও হয়েছিল অনায়াসসাচ্ছল্যে, যেন কোনো চিন্তাহীনতা

থেকে উদ্‌গম এ-সমস্ত পংক্তির। দপ্তরের ছেঁড়াখোড়া কাগজে, ইলাস্‌ট্রেটেড উইকলীর পৃষ্ঠার খালি জায়গার ফাঁকে-ফাঁকে, কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসের সবুজ বেতের চেয়ারে একঝাঁক ভিড়ে শনিবারের দুপুরে হেলান দিয়ে, সুরঞ্জন সরকারের ওয়াই. এম. সি. এ-র ঘরে চৌকির ছারপোকার সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে-চালাতে, যেন নেহাৎই ফরমায়েসী পদ্য লেখা হচ্ছে। রঙ্গ-রসিকতা-ফিচকেমি-বাচালতা, হঠাৎ, এরই মধ্যে, একেবারে গভীরে চ'লে যাওয়া, কবিতা যেন আমাদের হৃদয়ের দুর্ভেদ্যতম নিগড় এক মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে ফের বেরিয়ে এলো, পরিবেশের লঘুতা হঠাৎ দুঃসহ ভার হয়ে উঠলো, যে-নাগরের জন্য জীবনভর প্রতীক্ষা, সে এলো না, সে আসবে না, নিদাঘ দ্বিপ্রহরে কোনো ক্ষণিকার গ্রীষ্মকাতর পৃষ্ঠদেশের দূরাভাস, মরীচিকার মতো, আমাদের সত্তাকে নিংড়ে-মুচড়ে গেলো, তারপর প্রত্যহের নির্দয় প্রহারে বিলীন-বিবর্ণ তুমি নারী।

অশরীরী শব্দের ব্যঞ্জনা, যার অন্য নাম কবিতা। অথচ না রচনামুহূর্তে, না প্রকাশ্য আবৃত্তির ঋজুসারল্যে, এই যন্ত্রণার ঈষদাভাস পর্যন্ত উপস্থিত। কারণ স্পষ্ট। মানুষটির কোনো ভণিতা ছিল না, এবং মানুষটি প্রতিভাকে খুব আটপৌরে ক'রে নিয়েছিলেন। এটা কোনো অধীত-বিনয় নয়, মানুষটির প্রকৃতি। আত্মপ্রচার নেই, অনাড়ম্বতা। অক্ষম অনেকে, স্রেফ ঢাক-পেটানোর জোরে, নয় তো লজ্জাহীনতাকে অক্ষৌহিণী মূলধন হিশেবে ব্যবহার ক'রে, সমৃদ্ধিতে-চাকচিক্যে পৌঁছে গেছেন, অরুণকুমার সরকারেরই এপাশ-ওপাশ দিয়ে, কেউ-কেউ অরুণকুমার সরকারকে অবলম্বন ক'রে, কিন্তু অরুণকুমার সরকার নিজে নির্বিকার থেকেছেন। নির্বিকার, অবিকল, নিরাসক্ত, যেন ধ'রেই নিয়েছিলেন সাধারণ পরিভাষায় যাকে সাফল্য ব'লে ঘোষণা করা হয়, তা বড়ো নোংরা ব্যাপার : সেই সুড়ঙ্গে যারা প্রবেশ করতে চায় করুক, আমি নিজে, অসূয়াহীন, আমার ৪৫-এ রাসবিহারী এভিনিউর স্থিত আশ্রয়ে অবিচল থাকবো, অবিচল, অবিকৃত, অবিক্রীত ; আমার প্রসন্নতা সকলের জন্য উজাড় ক'রে দেবো।

কুটনি-কাটা নয়, পরশ্রীকাতরতা নয়, এই অন্বিত মানুষটি তাই এমনকি কবি হিশেবেও আদৌ তাঁর প্রাপ্য আজ পর্যন্ত পাননি। না কি পেয়েছেন? পেয়েছেন উদীয়মান যুবকের-প্রেমের-নিটোলতায়-আবিষ্ট-হয়ে-আসা যুবতীর স্বগত আবৃত্তিতে? শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিচারকেই আমরা ইতিহাসের অঙ্কে সমর্পণ ক'রে

যাই ; অরুণকুমার সরকারের ক্ষেত্রেও তাই হয় তো হবে। হয় তো বাইরের পৃথিবীর কাছে নিজেকে সতত প্রমাণ করবার কোনো তাগিদ ছিল না ব'লেই কবিতা লিখেছেন খুব কম ; যাঁরা কবি নন, তাঁদের রচনার আস্ফালন রাসবিহারী এভিনিউর দোতলার বারান্দা থেকে কিছুটা কৌতুকে, কিছুটা ঔদার্যে, কিছুটা হয় তো নিছক নিয়তি-কেন-বাধ্যতে এই অভিব্যক্তি নিয়ে, লক্ষ্য ক'রে গেছেন। শাদামাটার দল কবিতা লিখে, কবিতা লেখার ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে, যশের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গেছেন, অরুণকুমার সরকারের আদৌ যায় আসেনি তাতে। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে, এই নিরাসক্তির আরেকবার দেখা মেলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিসত্তায়। কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্তত বিদ্রূপে-ব্যঙ্গে চরিত্রহীন সুযোগসন্ধানীদের ধরাশায়ী করতে কখনো পিছুপা হননি ; অন্য পক্ষে অরুণকুমার সরকার বরাবরই শৃগালকুকুরদের সম্পর্কে নীরব। একমাত্র একটি কবিতায় ঘৃণার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার ইতিবাচক উল্লেখ আছে, কিন্তু তা-ও খুব পরিশীলিত উচ্চারণ। এই এড়িয়ে-যাওয়া, রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'ক্ষমাসুন্দর চক্ষে' সব-কিছু পারিপার্শ্বিক অপকৃষ্টতা মেনে-নেওয়া, প্রতিবাদে মুখর হওয়া নিয়ে অনীহা, কেউ-কেউকে হয়তো বিষণ্ণ করেছে, কিন্তু অরুণকুমার সরকার সেই বিষণ্ণতাকেও নিরভিমানে সংশ্লেষণ করতে পেরেছেন।

গুনতিতে কবিতার সংখ্যা এত কম, অথচ, যে-কথা কেউ বলেননি, অরুণকুমার সরকার প্রসঙ্গে ব'লেই হয় তো বলেননি, বাংলা কাব্যছন্দের কত অজস্র-নতুন পরীক্ষা এই ক'টি কবিতার মধ্যে ছড়ানো-ছিটোনো-জড়ানো। বৈয়াকরণ ছান্দসিকরা পূর্বজ প্রতিষ্ঠিত কবিদের রচনায় ছন্দবিপ্লব আবিষ্কার করেছেন, কোনো-কোনো অবিনয়ী উত্তরসূরী ছন্দহীনতাকে নববিধান হিশেবে দাবি করেছেন, অথচ ছন্দ নিয়ে আরো-অনেকের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ পরিশীলন ক'রে গেছেন যে-অরুণকুমার সরকার, তিনি অনুল্লেখিত থেকেছেন।

শুধু কবিতার কথাই বলবো ? অরুণকুমার সরকারের গদ্যের স্বভাবজ সুগঠন, যা তাঁর সমালোচনাপ্রবন্ধাদিকে আলোকিত করেছে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উত্তর-সময়ে, আমার বিবেচনায়, তুলনারহিত। এক হিশেবে অরুণকুমার সরকারের গদ্য সুধীন্দ্রনাথের শৈলীর চেয়েও সার্থকতর, কারণ তা শঙ্কিত শুচিতার দুর্ভারতা-মুক্ত। চিন্তার গভীরে সেই গদ্য অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছে নিয়ে যায়, প্রতিটি বাক্য ঠাসবুনুনি অথচ কবিতার মতো কলকাকলিময়, ঘরোয়া শব্দের পাশে

তৎসময় সহাবস্থান অন্যত্র বিস্ময়ের উদ্রেক করতো, অরুণকুমার সরকারের গদ্যে তা পরিপূর্ণ অন্বিত, মানুষটির মতোই। রবীন্দ্রনাথের পর, বাংলা গদ্যপ্রবন্ধের ভাষা নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে, রাজশেখর বসু থেকে শুরু ক'রে অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি অনেক ঘষামাজা করেছেন, কিন্তু অরুণকুমার সরকারকে কোনোরকম চিকীর্ষার ভিতর দিয়েই যেতে হয়নি, প্রথম থেকেই তিনি প্রবন্ধের ভাষায় আত্মস্থ। যে-কথাগুলি যেমনভাবে বলতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনভাবেই বলেছেন, কোনোরকম ব্যবহারিক অসুবিধা তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। অথচ, ইতস্তুতবিক্ষিপ্ত এ-ধরনের আলোচনাপ্রবন্ধের সংখ্যা হয় তো সব-মিলিয়ে দশ-বারোটির বেশি হবে না। এই মানুষটি পুরোপুরি নির্মোহ ছিলেন, যেহেতু আবাদে ও মরুদেশে শুধুমাত্র রঙের তফাত, কী হবে শুধু লেখার জন্যই লিখে, সে-রচনা যদিও যশস্বীদের প্রগল্ভতাকে পরিম্লান ক'রে দিতে পারে এক ঝলকে, একমাত্র সেই কারণেও কী হবে লিখে। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে এই অদ্ভুত নিরাসক্তি বাংলা সাহিত্যের প্রচুর ক্ষতির হেতু হয়ে রইলো, কিন্তু. আজকের অবসন্ন মুহূর্তে, এই মন্তব্যটুকু পর্যন্ত আমার বিবেচনায় প্রাসঙ্গিকতারহিত।

বহুদিন পর্যন্ত আমার কাছে, দুটি বিরাট ক্যামবিসের ঝোলায়, অরুণকুমার সরকারের ঝিকিমিকি গদ্যের নিদর্শনঠাসা অজস্র চিঠিপত্র ছিল। তাঁর নিরাসক্তির প্রতি সম্মান জানিয়ে, সেই ঝোলা দুটিও আজ হারিয়ে গেছে কোথায়, আমার কাছে যে-ক্ষতি শুধু অপূরণীয় নয়, মৃত্যুশোকেরই মতো। যেমন হারিয়ে গেছে সেই সঙ্গে, এখানে-ওখানে পুরোনো ভাঙা তোরঙ্গের জঞ্জালে নির্বাসিত, এখন পুরোপুরি বিস্মৃত, কোনো সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর কিছু-কিছু লঘুভার প্রবন্ধ, 'কলকাতার পার্ক' কি 'বালিগঞ্জের মেয়ে'। যেন মানুষটি, তাঁর প্রতিভার সমস্ত সম্ভার নিয়ে, হারিয়ে যাওয়ার জন্যই বদ্ধপরিকর ছিলেন। এখন একেবারেই হারিয়ে গেলেন, চুপি-চুপি, এমন কি অসুস্থতার শুরু থেকে মৃত্যু, এই সামান্য সময়সীমা পর্যন্ত, বড়ো গোপনে, কেউকে বিরক্ত-বিব্রত না-ক'রে, নিজের চরিত্রের সঙ্গে সমস্ত সংগতি রক্ষা ক'রে, নীরবে অতিবাহিত করলেন : অন্য-কোনোরকম নিষ্ক্রমণ অরুণকুমার সরকারের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেন আদৌ মেলানো যেত না।

আত্মগোপন, আত্মত্যাগ, অন্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, নিজের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে থাকা। পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধায় বিস্তৃত হওয়া, হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নয়

জীবনানন্দ দাশ নয় বিষ্ণু দে নয় বুদ্ধদেব বসুর প্রসঙ্গে যোজনের পর যোজন জুড়ে আলোচনা। অন্যথা, যাঁরা কনিষ্ঠ, তাঁদের দিকে প্রশ্রয়ের হাত বাড়ানো, তাঁদের রচনা নিয়ে বিশ্লেষণ-উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা। একমাত্র নিজের ভূমিকা উহ্য, অরুণকুমার সরকারকে ভুলে যাও তোমরা, অরুণকুমার সরকার কেউ না, একটু-আধটু কবিতা মক্সো করেছে মাত্র, একটা-দুটো প্রবন্ধ লিখেছে হয় তো, তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি মানায় না।

গোধূলিমুহূর্তে কার পূরবী কার বিভাসকে কানে-কানে কী ব'লে গেল, লেনদেনের হিশেবটা কোথায় গিয়ে ঠেকলো, তা নিয়ে মাথা-ঘামানো সম্ভবত অবান্তর। শেষ পর্যন্ত স্মৃতি ছাড়া কিছুই টেঁকে না, একান্ত স্মৃতি, কী হলাম, কী ক'রে হলাম, কাদের জড়িয়ে হলাম, কার কাছ থেকে কী পেয়েছিলাম, কাকে কী দেওয়া হয়নি, সমস্ত-কিছুর পুঞ্জ-পুঞ্জ স্মৃতি। অরুণকুমার সরকার-সুরঞ্জন সরকার-আমি, ১৯৪৬ সাল, ভরদুপুরে সাড়ে-ছ'আনার সীটে মেট্রো কি লাইটহাউসে কী-একটা মার্কিন ছবি দেখছি। ১৯৪৭ সাল, হায়াত খাঁ লেনে সু. স-র মেসের ঘর, যেন আমি শ্লথচক্র কবোষ্ণ ফিটনে, যেন আমি ময়দানের কুয়াশাকে দীর্ণ ক'রে রেড রোড থেকে চৌরঙ্গীর মুগ্ধতার মৌতাঁতে স্থবির; ১৯৪৮ সাল, সুরঞ্জনের ইডেন হাসপাতাল রোডের তেতলার কুঠুরিতে কাকে যেন বলা, বিকেলে হৃদয় বাতাসের উতরোল; সম্ভবত ঐ বছরই, আতোয়ার রহমানের 'চতুরঙ্গে'র ফ্ল্যাটে কোনো বৃষ্টি-ভেজা বিকেলে প্রাচীন শহরে অবাক অট্টালিকা নিষ্প্রাণ খড়খড়ির শিহরণ; ১৯৪৯ সাল, অরুণকুমার সরকার-আমি-আরো বোধ হয় কেউ, ল্যান্সডাউন রোডের বন্ধ গলির একতলার বাড়ির উঠোনে মাদুর-বিছোনো আড্ডায় ভয়চকিত জীবনানন্দ দাশ, রুলটানা খাতায় পেনসিলে কবিতার হিজিবিজি, শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার চিৎকার, এই সব ভয়াবহ আরতি, জীবনানন্দর দ্বিধাবিহ্বল প্রশ্ন, এ-কবিতা কি চলবে; ১৯৫০ সাল, রাতভর দেশপ্রিয় পার্কে অরুণকুমার সরকার-নরেশ-নিরুপম-আমি আড্ডা দিয়ে সকালে হঠাৎ, ঠিকানাহীন, নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া।

অসূয়াহীন সেই মানুষটি, অপোগণ্ডদের উৎসাহ দিতে জুড়ি ছিল না যে-মানুষটির, ৪৫-এ রাসবিহারী এভিনিউর ঠিকানায় এই এতগুলি বছর ধ'রে স্থিত-থাকা সেই মানুষটি, অন্তত এ-ভরসা ছিল দিনের কোলাহলের পর সেই মানুষটির সান্নিধ্যে, ছলছুতোহীন, আমি ফিরে যেতে পারবো। এখন থেকে আর পারবো না। কিছু স্মৃতির শব শুধু প'ড়ে রইলো, যার ভার বইতে, এই বাকি

সময়টা জুড়ে, এমনকি সুরঞ্জন সরকারও আর রইলেন না। হয় তো অভিমান, হয় তো অন্য-কিছু, অরুণকুমার সরকারের মৃত্যুর চার মাসের মধ্যে সুরঞ্জন সরকারও গত হলেন। তাঁদের পারস্পরিক সাযুজ্যের কথা, টায়-টায় পরিপূরণের কথা—একজনের বাইরেটা চাপা ভিতরে কৌতুক-কৌতূহলের ছলছল প্রবাহ, অন্যজনের বহিঃপরিচয় তীক্ষ্ণ-দুর্ধর্ষ-অবিনয়ী অথচ ভিতরে নিখাদকোমল কবিতা-সংগীতপ্রেম—লোকপ্রবাদ হয়েও আর বেঁচে থাকবে না। এখন থেকে স্মৃতির উত্তরাধিকার একমাত্র আমার, কোথায় এক সঙ্গে আমরা তিনজন—সঙ্গে হয় তো আরো-কোনো প্রগল্ভ যুবক—রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে গেছি, কিংবা ব্রিস্টলে-টেম্পলে-মন্টিকার্লোর প্রেক্ষিতে হস্তিনী মেয়ের মতো কদাকার এই পৃথিবীতে কোনো শঙ্খিনী মেয়ের মতো দাঁত দেখে চকিত হয়েছি, কিংবা কোনো প্রাগৈতিহাসিক পার্কের ঘাসে ব'সে 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি' বা 'বনলতা সেনে'র পুরোটা কাড়াকাড়ি ক'রে একে-অন্যকে শুনিয়েছি, এক বন্ধু অপরাপর বন্ধুদের কাছে নিঃসাড়ে কতভাবে যে ঋণী এই সমস্ত-কিছুর এলোমেলো অথচ আগাগোড়া দহিত-করা স্মৃতি। যে-আমি এখন সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী, সেই আমিও, দিনের কোলাহলের শেষে, হঠাৎ এই রূঢ় সত্যের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে স্তম্ভিত হয়ে আসি: নেই, সেই পরিচিত আশ্রয়গুলি আর নেই, সুরঞ্জন সরকারের ঠিকানা উধাও, ৪৫-এ রাসবিহারী এভিনিউতে দোতলায় উঠে আর কাকে ডাকবো এখন।

আমার বন্ধুরা মৃত, কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে আমার মৃত্যুও জড়িত, স্মৃতির সত্তায় তো কারো আলাদা অধিকার নেই, কলকাতার স্মৃতিমন্থিত রাস্তায়, আমার দুই বন্ধুকে বাদ দিয়ে, আমি একা কোন্ সাহসে হেঁটে পেরিয়ে যাবো? জৈবিক অর্থে আর যে-ক'টা দিন বাঁচবো, হাওয়ারা আমার দিকে তাকিয়ে হো হো ক'রে হাসবে, তারা আমাকে ১৯৪৬ সালের কলেজ স্ট্রীটের কফিখানায় তুলে নিয়ে যাবে, নয় তো অন্য-এক চিন্তায় অবিশ্রান্ত আমাকে উত্যক্ত করবে, তা হ'লে কি আলোক সরকারই ঠিক, লিখলুম বিচিত্রা দাশকে বহুদিন দেখিনি আকাশকে, তার অব্যবহিত পরের দুই পংক্তি: উষ্ণ তোমার স্মৃতি তবুও আমার এ-হৃদয়ের ফ্লাস্কে, তবে কি আমারই সংযোজন···? আমাদের বন্ধুত্ব আমাদের একাকার ক'রে দিয়েছিল, আমাদের বন্ধুত্ব আজ আমাকে নিঃস্বতায় নির্বাসিত করেছে। আমার আর কারোর সঙ্গেই সমস্বরে বলবার নেই: যা কিছু দেবার তোমাকেই সব দেয়। আমার শুধু এখন থেকে বিহ্বল উচ্চারণে আউড়ে-যাওয়া: কেবল

সান্ত্বনা এই তুমি আছো আর মৃত্যু আছে, রাত্রির অস্পষ্ট ঘ্রাণে প্রত্যাশায় রক্ত তাই নাচে।

মনে পড়ে সুরঞ্জন, কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে
মোমবাতি জ্বালা আধো অন্ধকারে আমরা দু'জনে
অখ্যাত কবির লেখা আধছেঁড়া একখানি বই
নগদ পাঁচ পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে প্রায় সারারাত
মুখস্থ করেছি বসে শিয়ালদায়, তোমার মেসের তক্তাপোশে ?

বইটার কি নাম ছিল ? সম্ভবত 'হলদে প্রজাপতি'।
কবির নামটা ঠিক মনে নেই। তবুও সে-বইয়ের অনেক
ধূসর কথার টুকরো মাঝে মাঝে আজো ভেসে আসে।
ফাল্গুনের অন্ধকার, নারীর শরীর আর জুনিপার বন।

কী অনুকম্পায়ী ছিল আমাদের প্রথম যৌবন।
বুদ্ধদেব বসু আর বিষ্ণু দে-র যাবতীয় লেখা
বারবার পড়ে তবু তৃপ্তি নেই কবিতা পড়ার,
জীবনানন্দ দাশে অতঃপর অভিভূত হয়েও তবুও
অজানা কবির লেখা স্টলে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করেছি।
'হলদে প্রজাপতি' সেই ক্ষুধার্ত দিনের আবিষ্কার।

মনে পড়ে সুরঞ্জন, সেই সব প্রয়োন্মাদ দিন
আমাদের কথাবার্তা কবিতার উদ্ধৃতিতে ভরা ?
ঢাকার অশোক মিত্র ? স্বপ্নময় ভোরের শিশির ?
পুরুষের দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণার গোপন বৈভব !

সে কবি কোথায় আজ, 'হলদে প্রজাপতি' যার লেখা
তার কি স্মরণে আছে একদা সে লিখত কবিতা ?
যেখানেই থাক, সে তো কোনদিন জানবে না আর
কোনদিন জানবে না একদিন দু'জন যুবক
ভালোবেসে পড়েছিল তারও লেখা সারারাত জেগে।

('হলদে প্রজাপতি', অরুণকুমার সরকার)

স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো

স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো : জীবনানন্দের এই পংক্তিটি থেকে আর এখন মুখ ঘুরিয়ে থাকা যায় না। বয়স সায়াহ্নের দিকে ঢলছে, পৃথিবী তুখোড় যুবক-যুবতীতে সমাচ্ছন্ন, তাঁরা চোখোচোখি দেখা হ'লে করুণা ক'রে পাশে স'রে দাঁড়ান, আমাদের জড়ত্বের অভিসারে তাঁরা বাধা হ'তে আদৌ চান না। একটু বাড়তি বিনয়ের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন, ব্যাকুল বাদল-সাঁঝে যাদের দিন ফুরুচ্ছে, তাদের আর ব্যথা দিয়ে কী লাভ।

আমরা লজ্জা পাই, আমরাও তাঁদের প্রতিবন্ধক হ'তে চাই না, কুঁকড়ে আসি নিজেদের মধ্যে। এবং, স্থবিরতার যা প্রথম লক্ষণ, স্মৃতির কবর খুঁড়তে গাঁইতি-শাবল নিয়ে নেমে পড়ি।

মুস্কিল হলো একদেশদর্শী স্মৃতি নিয়ে। গাঁইতি-শাবলদের একটা জায়গায় সে দাঁড় করিয়ে রাখবে, অনেকক্ষণ ধ'রে। সেটা কি ১৯৪৪ সাল, না কি ১৯৪৫ সাল, না কি তার পরের বছর, না কি সে-সব ক'টি বছর একত্র জড়ো-করানো কুহকিনী মায়া? আমাদের চেতনার পরতে-পরতে তখন দেশ-সমাজের চিন্তা স্রোতের মত বইছে, ঐ বয়সে, দেশের-সমাজের ঐ সন্ধিমুহূর্তে, না-ব'য়ে পারে না, কিন্তু স্মৃতি যে-কথা আকারে-ইঙ্গিতে পর-পর ক'রে বলতে চাইছে, আরো-একটি চিন্তা, পাশাপাশি, চেতনাকে যা অধিকার ক'রে ছিল, তার কথা : কবিতার চিন্তা, কবিতার কথা, কবিতার স্বপ্ন। ঐ ক'বছর আমরা তিন জনে মিলে, অরুণকুমার সরকার, স্বরঞ্জন সরকার, আমি, কত হাজার কবিতা পড়েছিলাম, কত কবিতা কণ্ঠস্থ ছিল আমাদের, পরস্পরকে কত হাজার কবিতার পংক্তির-পর-পংক্তি শুনিয়ে, কত যোজনের পর যোজন পায়ে হেঁটে, অথচ আসলে আকাশে উড়ে, চ'লে যেতে পারতাম? কত কবিদের আমরা আবিষ্কার করেছিলাম ঐ ক'টি বছর জুড়ে, কত কবিতাকে? এখনকার মতো বেপরোয়া সাহসে কবিতা ছাপা

হতো না তখন, আমরা বুভুক্ষু, আমরা খুঁজে ফিরতাম কবিতার-পর-কবিতাকে, যে-কবিতায় দেশ আছে, সমাজ আছে, প্রেম আছে, সব চেয়ে যা বড়ো কথা, যে-কবিতায় হৃদয় আছে, শব্দের জাদুতে যে-হৃদয় আমাদের কাছাকাছি চ'লে আসতো, আমাদের পাশাপাশি।

অথচ, কী আশ্চর্য, তবুও বাংলা কবিতার ইতিহাসে সুরঞ্জন সরকারের নাম অনুচ্চারিত থেকে যাবে, কেউ তাঁকে মনে রাখবে না, তাঁর নামে কোনো প্রকোষ্ঠে স্মৃতিফলক বসবে না। অনাদৃত জীবনানন্দ দাশ, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে কারো আগ্রহ নেই, প্রথম সংস্করণের শো দেড়েক কপি, অবিক্রীত, কোনো তোরঙ্গের মধ্যে প'ড়ে আছে বছরের-পর-বছর ধ'রে। ক'জন জানেন, ক'জন মনে রেখেছেন, ইতিহাসে কে কোথায় কবে তা লিখবেন, সুরঞ্জন সরকার গোটা মাসের উপার্জনের টাকা ঢেলে সেই দেড়শো কপি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কিনে ট্যাক্সি চাপিয়ে নিজের আস্তানায় নিয়ে এসেছিলেন, জনে-জনে তা তার পর উপহার পাঠিয়েছিলেন। 'আকাশলীনা' কবিতা প্রকাশিত হবার পর, এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে, আড্ডার মায়া কাটিয়ে এক বন্ধু এক ট্রামের শরীরে প্রবেশ করতে উদ্যত, হঠাৎ দুই হাত বিস্তারিত-প্রসারিত ক'রে, গোটা ট্রাম-লাইন জুড়ে, সুরঞ্জন সরকারের বিকট আবেদন : 'অই ট্রামে যেয়ো নাকো তুমি'। অরুণকুমার সরকার-রচিত, ঈষৎ রূপান্তরিত, পংক্তিদ্বয়কে হয় তো অনেকের মনে আছে, কিন্তু ক'জন আর এই ইতিহাসসিদ্ধ সাক্ষ্য বহন করবেন যে আদিরূপে তা ছিল 'হস্তিনী মেয়ের মতো কদাকার এই পৃথিবীতে শঙ্খিনী মেয়ের মতো সুরঞ্জন সরকারের দাঁত'।

১৯৪৬ সাল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাদ্রের কলকাতা থমথমে, জীবনযাত্রা স্তব্ধ, যানবাহন অন্তর্হিত, এখানে-ওখানে অগ্নিসংযোগ, এখানে-ওখানে ঘাতকের ছুরি, শহর ছড়িয়ে গুজব। এরই মধ্যে, দুঃসাহসী সুরঞ্জন সরকার, খবর পৌঁছেছে গৃহস্থেরা-আতঙ্কে-পরিত্যাগ-ক'রে-গেছেন-যে-বাড়ি, তার তেতলার কুঠুরিতে অনেক কবিতার বই মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে। কারফিউ, পুলিশ-গাড়ির টহল, ছমছম অন্ধকার, গুমোট, রাত এগারোটা অতিক্রান্ত, দলনেতা সুরঞ্জন সরকার, যুবকের দল এগোচ্ছে। ঐ কুঠুরি থেকে কবিতার বই লুঠ ক'রে আনতে হবে, মনে পড়ে এক কাঁড়ি কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে সেই রাত্তিরে ফাউ মিলেছিল একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু ক'রে 'পরিচয়' ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার গোটা সেট।

'কবিতা পড়ুন' আন্দোলনেরও অন্তত গোটা বছর দশেক আগে, সুরঞ্জন

সরকারের একক দুর্দান্ত প্রয়াস, ঝাঁকে-ঝাঁকে কবিতা-পড়া, কবিতার চাপান, কবিতার উতোর। লক্ষ-লক্ষ কবিতা লেখা হতো না তখন, লক্ষ-লক্ষ কবির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হতো না আমাদের, কিন্তু এমন-কোনো কবিতা লেখা হতো না, এমন-কোনো কবি রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে হেঁটে যেতেন না, যা বা যিনি সুরঞ্জন সরকারের অপরিচিত। একজন ছিলেন, কৃষ্ণদাস গুপ্ত, এখন যেখানেই অধিষ্ঠিত থাকুন তিনি, তাঁর নিশ্চয়ই নির্বাপিত স্মৃতি যে তিনিও একদিন কবিতা লিখতেন, কিন্তু, কলেজ স্ট্রীটের ধূসর সন্ধ্যা, ফুটপাতের দোকান থেকে সুরঞ্জন সরকার ন'পয়সা দিয়ে পীত মলাটের চটি কবিতার বই কিনে এনে কফি হাউসের সবুজ বেতের চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে আমাদের জ্ঞাত করেছিলেন সেই কবির সারাৎসারদর্শন : 'কিছুই ভালো লাগে না, সাধুরা তাই গাঁজা খায়'।

এখন তো কবিদের ক্ষেত্রে, কবিতার ক্ষেত্রে, সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেছে, অমুক কবি 'দেশপ্রেমিক' অতএব আমাদের দলে, অমুক কবি বামাচারী সুতরাং পংক্তির বাইরে। সুরঞ্জন সরকারের পৃথিবীতে কিন্তু এক আশ্চর্য অখণ্ডতা ছিল। 'এখনো বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে'র পাশাপাশি আমরা 'জাপ পুষ্পকে ঝরে ঝুলঝুড়ি, জলে হ্যাংকাও কমরেড আজ বজ্রকঠিন বন্ধুতা চাও' সুরঞ্জন সরকারের তক্তাপোশে গা এলিয়ে সমান গাঢ়তার সঙ্গে আবৃত্তি ক'রে পরস্পরকে শুনিয়েছি, খানিক বাদে সমর সেন পেরিয়ে বুদ্ধদেব বসুর বুড়ি ছুঁয়ে পৌছে গেছি বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে কৌতুকবিহারে : 'কন্যকাদানে ধরারে করেছে ধন্য, পিতা যে তোমার তাই তো সন্ধ্যা রাঙবে'। তার পরক্ষণেই হয়তো কণ্ঠস্বরে ধ্রুপদী ভাব ঢেলে নাটকের শীর্ষবিন্দুতে পৌছেছি : 'হলা পিয়া সহি, জান্তব জিগীষা বক্ষে অতীতের সে-নিষাদ নহি আমি নহি'। ট্রামের অপরাহ্নিক ভিড়ে, ডবল ডেকার বাসের দোতলায়, চৌরঙ্গীর ফুটপাথে, বাবুঘাটের ভাসানো রেস্তরাঁর ডেকে, রেড রোডে মাঘের রাতের কুয়াশা-জমাট ভিক্টোরিয়া গাড়ির নিশ্চিন্ত মন্থরতায়, কবিতা প্রপাতের মতো উপচে পড়েছে, সেই প্রপাতে, প্রতিদিন-প্রথম-ঝাঁপ-দেনেওয়ালা, সুরঞ্জন সরকার।

আমাদের তিনজনের মধ্যে কবিপ্রতিভা ছিল একমাত্র অরুণকুমার সরকারের। অথচ, কী অদ্ভুত সময় ছিল তখন, ব্যক্তিত্বের ভেদাভেদ পুরোপুরি ঘুচিয়ে, অরুণকুমার সরসারের সৃষ্টিকর্মে আমাদের বাকি দু'জনেরও যেন অখণ্ড অধিকার। কী কবিতা লেখা হবে, কখন কবিতা লেখা হবে, কোথায় সে-

কবিতা প্রথম পাঠ করা হবে, কোন্ পংক্তি একটু দোমড়ানো প্রয়োজন, কোথায় কোন্ বাক্যাংশ যথেষ্ট মসৃণ হয়নি, এ-সমস্ত বিষয়ে আমরা যেন যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো, এবং সব শেষের চূড়ান্ত বিচারের দায় অরুণকুমার সরকারের নয়, সুরঞ্জন সরকারের। সুরঞ্জন সরকারকে কেউ কবিপ্রকৃতির ব'লে ভুল করবে না, তাঁর বহিরাবরণে রূঢ়তা, প্রথাসিদ্ধ কবিমন্য ন্যাকামি তাঁর কাছে অসহ্য, এবং সে-অসহিষ্ণুতা ঘোষিত হতো সরবে, সুতীক্ষ্ণ বাক্যপ্রয়োগে, যার সঙ্গে হয় তো মেশানো থাকতো এদেশী কিংবা ওদেশী প্রাকৃতবাচন। অথচ সেই মানুষই মাসের আটাশ কি উনতিরিশ তারিখে, পকেটের-পার্সের সমস্ত অবশিষ্ট টাকা উজাড় ক'রে, চারটা-পাঁচটা-ছ'টা নতুন কবিতার বই কিনে এনে, যেহেতু বাইরে খেতে যাওয়ার মতো আর পয়সা নেই, সকালে ফের টাকা ধার করতে হবে, কলেজ স্ট্রীট ওয়াই. এম. সি. এ-র তেতলার ঘরে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে, কবিতার-পর-কবিতা, মৃদু, স্বচ্ছন্দে উচ্চারণে, পাঠনিরত। হ্যারিসন রোডের কোলাহল মধ্য-রাত্রির পর নীরব হয়ে আসে. ট্রামের গোঙানি পর্যন্ত স্তব্ধ, কবিতার পাঠ তখনও চলছে, কবিতায় মগ্ন, কবিতায় মুহ্যমান, কবিতায় নেশাগ্রস্ত, হঠাৎ একটা সময়ে তার পর ঘুমিয়ে প'ড়ে, পরদিন সকালে উঠে প্রথম উচ্চারণ : 'গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল', যেন কবিতার খোঁয়াড়ি ভাঙা হচ্ছে।

'ঘরের ভিতরে কেউ খোঁয়াড়ি ভাঙছে ব'লে কপাটের জং নিরস্ত হয় না তার আপন ক্ষয়ের ব্যবসায়ে' : সুরঞ্জন সরকারের প্রিয় ঘোষণা ছিল এটা। বাংলা দেশে নতুন-এক সাংস্কৃতিক বিভঙ্গের শুরু মধ্যচল্লিশের দশক থেকে। হয় তো তারও কিছু আগে থেকে, আমাদের ঘরোয়া যুক্তি-তর্কে-মন্তব্যে, আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের পুঞ্জিত ঐশ্বর্য থেকে বিচ্ছিন্ন কলি আচমকা ব্যবহার করতে শুরু করি, যেমন 'তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি', যেমন 'তুমি যেও না এখনি, এখনো রয়েছে রজনী', যেমন 'খোলো খোলো দ্বার রাখিও না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে', যেমন 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা কোরো না হেলা হে গরবিণী'। উদাহরণের সংখ্যা বহুগুণ বাড়ানো যায়, কিন্তু দরকার নেই তার : যে-কোনো বাঙালি জানেন, তাঁর ধমনীতে-চেতনায় রবীন্দ্রনাথের গানের কলির ইশারা, যে-কোনো অবস্থায়, দুঃখে-বিষাদে-আনন্দে-হরিষে, প্রসন্ন সরলতায় হোক, ব্যঙ্গে তির্যক ক'রে হোক, আমরা রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো গানের টুকরো আমাদের কথোপকথনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারি, যার ফলে আমাদের আলাপ-বিনিময়ে গুণান্তর ঘটে, আমরা সংস্কৃততর হই। আজ থেকে চল্লিশ

বছর আগে, ক'জন আর মনে রেখেছেন সে-কথা, সুরঞ্জন সরকার সংস্কৃত বাঙালির কথোপকথনে অন্য-এক গোত্রান্তর ঘটালেন, আমাদের কথাবার্তায়, আমাদের সম্ভাষণে, আমাদের গাল-পাড়ায়, আমাদের পরচর্চায় বাংলা কবিতার বোল প্রবেশ করলো : 'আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?' 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধাবনে', 'দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে', 'ভিখিরিকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্রবৌ সকলে নারাজ', 'নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ', 'অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে', 'তুমিও বিখ্যাত হ'লে, সেই দুঃখে লিখি না কবিতা', 'বন্ধু হওয়াটা কবিদের, ভেবে ত্মাখো কত সুবিধের,' 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে,' 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে'। এখানেও উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে যেমন, দুঃসাহসী পুরুষ সুরঞ্জন সরকার, বাংলা কবিতাকে জীবনের সঙ্গে, জীবনধারণের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। স্মৃতি আমাকে অহরহ প্রহার ক'রে বেড়ায়, হয় তো ইডেন হাসপাতাল রোডে তাঁর তেতলার ঘর, নরকগুলজার আড্ডার পর সদ্যপরিচিত কেউ বিদায় নিচ্ছেন, দোরগোড়ায় উজ্জ্বলানন সুরঞ্জন সরকার শেষ সম্ভাষণ জানাচ্ছেন : 'আবার আসিও তুমি, আসিবার ইচ্ছা যদি হয়'। হয় তো কফি হাউসের উত্তর-পশ্চিম কোণে, শনিবারের জমাট সন্ধ্যায় এক পণ্ডিতমন্য প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে, এর-ওর-তার কবিতার দার্শনিক তত্ত্ব শুনিয়ে যাচ্ছেন, কবিতা কেন কবিতা হয়নি তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছেন, অন্য সবাই বিব্রত, হঠাৎ নতুন-একটি সিগারেট ধরিয়ে, এক রাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে, সেই ধোঁয়া ছাপিয়ে সুরঞ্জন সরকারের অস্বগত-অনস্পষ্ট উচ্চারণ : 'বরং নিজেই তুমি লেখ নাক' একটি কবিতা'। এক দুরন্ত-অভব্য আড্ডার পরে, অপগত মধ্যরাত্রি, ডেরায় ফিরবো আমরা কয়েকজন, মাইলের-পর-মাইল হাঁটছি, পায়ের পেশী শিথিল হ'তে চাইছে, হঠাৎ সুরঞ্জন সরকার : 'হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'। অথবা কোনো-এক ঝড়ের দুপুরে জানালার সার্শির সশব্দ চঞ্চলতা, হঠাৎ গলা সরু ক'রে ব্যঙ্গনিপুণ সুরঞ্জন সরকার : 'এই দুষ্টু হাওয়া নিয়ে কত আর পারি ?'

পথিকৃৎ সুরঞ্জন সরকার, 'কবিতা পড়ুন' আন্দোলনের আরো অন্তত দশ বছর আগে থেকে যিনি কবিতা পড়ছিলেন, কবিতাকে বাঙালি সংসারে স্বতঃসিদ্ধতা হিশেবে প্রবিষ্ট করাতে চেয়েছিলেন যিনি। সে-সময়টার কথা ভাবুন, সমকালীন কবিতা সম্বন্ধে ঢালাও সিদ্ধান্তের ঋতু : 'দুর্বোধ্য', 'শনিবারের চিঠি'র অপ্রতিহত

ঘোড়সওয়ার-বৃত্তি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ক্রান্তি, দেশভাগ, সর্বত্র থরোথরো অস্থিরতা, কিন্তু বাঙালি চেতনার সঙ্গে কবিতাকে মিলিয়ে দিতেই হবে, 'মেলাবেন, তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার ঐ ভাঙা দরজাটা মেলাবেন', সুরঞ্জন সরকার, বস্তুত একা, বাংলা সংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছিলেন, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে।

এতদিনে আমরা কবিতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। লক্ষ-লক্ষ কবিতা, বাংলা কবিতা, লেখা হয় এখন, এ-বাংলায়, ও-বাংলায় লক্ষ-লক্ষ কবি। জঙ্গী কবিতা, মৃদুমিহিন কবিতা, আঁটোসাঁটো ছন্দোবদ্ধ কবিতা, আটপৌরে ঘরোয়া আবেগের কবিতা। কবিতা বাঙালি জীবনে সহজ হয়ে এসেছে, প্রাত্যহিক অভ্যাসের মতো এখন কবিতার চর্চা। অলিন্দে-প্রকোষ্ঠে কবিতা, আবাহনে-বিসর্জনে কবিতা, এমন কি কবিতাকে দুমড়ে-মুচড়ে এখন গানের পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার তন্নিষ্ঠ চর্চা চলছে। কবিতার এই রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে দাঁড়িয়ে, আমি কিন্তু অথচ বর্তমানভ্রষ্ট হয়ে যাই, হয় তো ১৯৪৪ সাল, হয় তো ১৯৪৫ সাল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে কি হয়নি, নীলাভ-আলো-জ্বালা ঘর, যুগের সঞ্চিত পণ্য নিয়েই যেন এক মহিলার সমীপে সুরঞ্জন সরকার, যে-মহিলা তাঁর প্রেমিকা নন, তথাচ তাঁকে, এক নিখুঁত-বাঁধাই কবিতার বই উপহার, শিরোনাম-পৃষ্ঠায় বেপরোয়া সুরঞ্জন সরকারের উৎসর্গ স্বাক্ষর: 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস'। পৃথিবীতে সাহসের শেষ নেই, কিন্তু সাহসের শুরুর যে-ইতিহাস, তার নায়কপুরুষ সুরঞ্জন সরকারকে সেদিন আমি দেখেছিলাম।

কিন্তু, বহুবার বহু অবস্থায়, সুরঞ্জন সরকার, লজ্জের মতো ক'রে যা আবৃত্তি করতেন, 'যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায় অপরের সুযোগের মতো মনে হয়'। আজ থেকে আড়াই বছর আগে পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন সুরঞ্জন সরকার, আমার বিনীত বিবেচনায় বাংলা সংস্কৃতিকে এক নতুন পরি-মণ্ডলে উত্তীর্ণ ক'রে গেছেন তিনি, অথচ, কী আশ্চর্য, তাঁর কথা কোনো স্মৃতি-ফলকে ধরা থাকবে না, আমাদের মতো ঈষৎ কয়েকজন সায়াহ্নবর্তীদের নিষ্ক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্মৃতি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শেষের কয়েক বছর বড়ো ভ্যাবাচ্যাকা মানসিকতা-আক্রান্ত ছিলেন সুরঞ্জন সরকার, যেন নিজের পৃথিবীকেই আর চিনতে পারছিলেন না। কবিতায় সমাচ্ছন্ন কলকাতা-বাংলা দেশ, কবিতার এই হট্টমেলায় তাঁকে মনে হতো বড়ো বেশি নিঃসঙ্গ, যেন তাঁর অন্তরঙ্গতম বন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে, কবিতাকে প্রাণপণে বলতে চাইছেন:

এসো না কো আমার শয্যায়, এসো না কো প্রাত্যহিকতায়। হয় তো, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে, সায়াহ্নঋতুকে বার-বার ক'রে তাঁর অভিজ্ঞানউচ্চারণ : বিলীন বিবর্ণ তুমি নারী।

চল্লিশ বছর পিছনে ফিরে চলুন, সুরঞ্জন সরকারের মতো মাত্র কয়েকজন কবিতা পড়তেন। এখন যে-কেউই কবিতা পড়েন। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে সুরঞ্জন সরকার শুরু করেছিলেন ব'লেই, এটা আমার ধর্মবিশ্বাস, এখন যে-কেউই পড়েন। আমরা কি তা হ'লে উজ্জ্বলতার দিকে এগোচ্ছি? জানি না সুরঞ্জন সরকার কী বিচারে পৌঁছুতেন। 'এইখানে শুয়ে আছে মৃণালিণী ঘোষালের শব ; জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কি না' : কে জানে, হয় তো এই হেঁয়ালির মধ্যবর্তিতায় সুরঞ্জন সরকার উপাখ্যান শেষ করতেন। মাঝে-মাঝে ভুলে যাই, তাঁকে পাকড়ে এই প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর সংগ্রহের সুযোগ আর হবার নয়। স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো।

আতোয়ার রহমান : কিছু স্মৃতি, কিছু গ্লানিবোধ

কিছুদিন আগে লোকমুখে শুনতে পেলাম, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা আর ত্রৈমাসিক থাকছে না, এখন থেকে প্রতি মাসে, বছরে বারো বার, বেরোবে। খবরটা জেনে, এই সাত বছরের ব্যবধানে আরেকবার, নতুন ক'রে আতোয়ার রহমানের মৃত্যুজনিত শোক পেলাম।

তবে এ-ধরনের শোকানুভূতি তো বিলাস, ব্যক্তিগত বিলাস। পৃথিবী তার নিজের নিয়মে চলবে। 'চতুরঙ্গ' কী ছিল, তাকে এখন কী করা হচ্ছে, তা নিয়ে, একমাত্র স্মৃতিরোমন্থকরা ছাড়া, কেউই আলাদা ক'রে ভাবনাকে প্রশ্রয় দেবেন না। আমার মতো একজন-দুজন, যদি এই প্রসঙ্গে একটু বেশি আকুলি-বিকুলি করি, হয়তো গাল পাড়া হবে : স্মৃতি ধুয়ে কি জল খাবো আমরা? এবং সে-কারণেই, আতোয়ার রহমান সম্পর্কে যখন আমাকে লিখতে বলা হয়, অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি : 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রেখে তো আতোয়ার রহমান সম্বন্ধে লেখা সম্ভব নয়, জীবনানন্দের পংক্তিতে পৌঁছে যেতে হয় আমাকে : কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার নামকরণ কে করেছিলেন আমার জানা নেই, সন্দেহ হয় বুদ্ধদেব বসু, যিনি পত্রিকার প্রথম বছরে, হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে, যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। চারটি অঙ্গের সংশ্লেষণ 'চতুরঙ্গ', তাকে কেটে বারোটি টুকরো করলে তা ব্যভিচার। প্রথম বছর পেরোবার পর, হুমায়ুন কবিরের মৃত্যু পর্যন্ত, একমাত্র তাঁর নাম ছাপা হতো সম্পাদক হিশেবে, কিন্তু তখন থেকেই, ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর নিজের মৃত্যু পর্যন্ত, পত্রিকাটি আসলে ছিল আতোয়ার রহমানের সত্তা-স্বাক্ষর-ঠিকানা-পরিচয়। লালন করেছেন. পালন করেছেন, কিশোরী থেকে

যুবতী হ'তে দেখেছেন নিজের দুহিতাকে, সেই দুহিতার অঙ্গব্যবচ্ছেদ তাঁকে মৃত্যুমুখগামী করতো। সাত বছর আগে গত হয়ে রেহাই পেয়েছেন তিনি।

কথাগুলি নিশ্চয়ই একটু কর্কশ শোনাচ্ছে, কিন্তু না ব'লে উপায় নেই আমার। আতোয়ার রহমানের যে চরিত্র্যবৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তা তাঁর খুঁতখুঁতেপনা। সকাল দুপুরে গড়াতে যাওয়ার উপক্রম, যমুনাতে জল ব'য়ে যায় তো যাচ্ছে, 'চতুরঙ্গ' দপ্তরে আমি একা, কিংবা হয় তো পাশে আরো অন্য-কেউ, টেবিলে কোনো বিদেশী সাহিত্যপত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছি, ক্ষৌরকর্মরত আতোয়ার রহমানের খুঁতখুঁতির কোনো শেষ নেই, দাড়ি-কামানোও শিল্পকর্ম, আমি হয় তো ইতিমধ্যে সাহিত্যপত্রিকাটি আদ্যোপান্ত পুরো প'ড়ে ফেলেছি, নয় তো 'চতুরঙ্গে'র আসন্ন সংখ্যার তিন ফরমা প্রুফ দেখা শেষ ক'রে এনেছি, আতোয়ার রহমানের ক্ষৌরচর্চা শেষ হচ্ছে না তবুও : আমার স্মৃতিতে এটি কোনো বিশেষ প্রভাতের ঘটনা নয়, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউস্থ ফ্ল্যাটের পুরো আমেজই ছিল আতোয়ার রহমানের এই ক্ষৌরকর্মসমারোহের নিত্য-পদ্ধতির মধ্যে। মানুষটির সৌন্দর্যতত্ত্ব বলুন, অহংবোধ বলুন, তার প্রকাশই ছিল এ-ধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ততায়। আমরা যে-কাজেই হাত দিই না, সর্বাঙ্গসুন্দর করবো, সম্পূর্ণ করবো, ত্রুটিহীন করবো, সেটা অঙ্গসজ্জার ব্যাপারই হোক কিংবা পত্রিকাপ্রকাশের ব্যাপারই হোক। বিদেশীরা যদি পারে, আমরা পারবো না কেন সুন্দর ক'রে বই বের করতে, সাহিত্যপত্রিকা বের করতে ? লোকপ্রবাদ যা-ই হোক, প্রথম এক বছর-দুবছর অতিক্রান্ত হবার পর, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সঙ্গে হুমায়ুন কবিরের সম্পর্ক নেহাতই আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাঁকে বাদ দিয়ে তাই অতি স্বচ্ছন্দে 'চতুরঙ্গে'র অস্তিত্বের কথা ভাবা যেত। কিন্তু আতোয়ার রহমানকে বাদ দিয়ে যেত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ সময় থেকে শুরু ক'রে তাঁর দেহাবসানের তারিখ পর্যন্ত, 'চতুরঙ্গ' ছিল একান্তই আতোয়ার রহমানের পত্রিকা। আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়, আতোয়ার রহমানের ব্যক্তিত্ব, আতোয়ার রহমানের সত্তা।

এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব। তাঁর একান্ত নিজের মতো ক'রে আতোয়ার রহমান, যে-কোনো ব্যাপারে, উৎকর্ষের উপাসক ছিলেন। দাড়ি-কামানোর প্রসঙ্গটি দৃষ্টান্ত হিশেবে আমি ব্যবহার করেছি, কিন্তু খাদ্যে-পোশাকে-চিন্তায়-বিনোদনে-বিহারে, জীবনের প্রতিটি বিভঙ্গেই, আতোয়ার রহমানের, উৎকর্ষের অন্বেষণে এক প্রচণ্ড একরোখোমি ছিল। সন্দেশের সাধ হ'লে কলকাতা শহরের সবচেয়ে

সেরা সন্দেশ, কোনো উজ্জ্বল মহিলাকে শাড়ি উপহার দিতে হ'লে কাঞ্চীপুরম্ বা বারাণসীর মহার্ঘতম জরিতে-চুবোনো মসৃণতম নিদর্শন, আসবাব কিনতে হ'লে সবচেয়ে সরেস কাঠের সবচেয়ে ওস্তাদ চীনে ছুতোরের শিল্পকর্ম। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হ'লে চলবে না, 'চতুরঙ্গ'কে সারা দেশের কাছে আদর্শস্থানীয় ক'রে তুলতে হবে, বিদেশীরা যা পারে, আমরা, এই-এখনো-পরাধীন ভারতীয়রাও, সেই উৎকর্ষের শিখরে নিজেদের পৌঁছে দিতে পারি, তা প্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে। উৎকর্ষের দুই প্রসঙ্গ : বিষয়গত উৎকর্ষ, সেই সঙ্গে সৌষ্ঠবগতও। ঐ দাড়ি-কামানোর মতোই, আতোয়ার রহমানকে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দেখেছি হাতে একটা স্কেল নিয়ে 'চতুরঙ্গে'র রূপচর্চা নিয়ে চিন্তা করছেন, একটি নতুন প্রবন্ধের শুরুতে উপরে কতটা ছাড় দেওয়া হবে, ডাইনে-বাঁয়ে কয় সেন্টিমিটার শূন্যস্থান থাকবে, যদি সাত পংক্তির কবিতাও হয় ভুলে গেলে চলবে না কাব্যকর্ম মহান্ সৃষ্টির সমার্থক, গোটা একটি পৃষ্ঠা জুড়ে সেই কবিতাকে আসন দিতে হবে। 'চতুরঙ্গ' ছাপতে হবে কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ মুদ্রণাগারে, অভিজাত লাইনোটাইপে ; যে-কাগজে ছাপা হবে তা কতটা পুরু হবে, কতটা শাদা হবে তা নিয়ে ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন আলাপ : বাজার থেকে হঠাৎ কাগজ উধাও, প্রথম ক'টি ফরমা যে-কাগজে ছাপা হয়েছে তা আর পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ত্রুটিহীনতা থেকে স্খলিত হ'লে চলবে না, ওই সংখ্যার প্রকাশ বরঞ্চ এক মাস পিছিয়ে যাক কিন্তু দু'রকম কাগজে 'চতুরঙ্গ' ছাপা চলবে না। যেমন, ইওরোপীয় পোশাক যদি পরতেই হয়, তবে শার্টের গলার কাছের বোতাম এমনভাবে গাঁথা চাই, টাইয়ের বাঁধন এমন নিখুঁত হওয়া চাই, যে বোতামটা উঁকি দেবে না, কারণ টাই-আঁটাও তো শিল্পকর্ম, তাতে ত্রুটিহীনতা থেকে বিচ্যুতি ঘটবে কেন।

আতোয়ার রহমান নিজে, পোশাকি অর্থে, সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু সাহিত্যপ্রকাশনাও শিল্প, সৃষ্টিকর্ম, সেখানেও শ্রেষ্ঠত্বের অন্বেষণ থেকে স্খলিত হ'লে চলবে না। আমার নিজের যে-বৃত্তি, তাতে আমি পরাকাষ্ঠা ছুঁয়ে যাবো, এই প্রতিজ্ঞা আমরা অনেকেই জীবনে পালন করতে পারি না, কিন্তু প্রতিজ্ঞাটির অন্তঃস্থিত প্রজ্ঞা সম্পর্কেই বা আমাদের ক'জনের অনুভূতিতে সুচেতনা দোলা দিয়ে যায় ? আমরা এই মুহূর্তে যেখানে, তা ছাড়িয়ে যেতে পারি, উৎকর্ষের মহত্তর এক স্তরে নিজেদের উত্তীর্ণ করতে পারি, সমস্ত সৃষ্টির আকর এই অহংবোধ। আতোয়ার রহমানের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই অহংকারকে পরিব্যাপ্ত দেখে, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার মুহূর্তে যে-মুগ্ধতাবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, তার

ঘোর থেকে আমি কোনোদিন পরিত্রাণ পাই নি। দেশ দুদিন বাদে স্বাধীন হবে, আমরাও এখানে পোয়েট্রি, ক্রাইটেরিয়ান, হরাইজন, পার্টিজান রিভিউ-র মতো পত্রিকা বের করবো, সমস্ত পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবো উজ্জ্বলতা কাকে বলে, উৎকর্ষ কাকে বলে, বাঙালির সাহিত্য কোন্ মহত্ত্বে পৌছেছে, আর কোন্ মহত্ত্বে অচিরে পৌছবে। এবং সেজন্যই, বহিঃসৌষ্ঠবের পাশাপাশি, 'চতুরঙ্গে'র আভ্যন্তরিক সত্তার নিয়ে চিন্তা। বিষয় যা-ই হোক না কেন, সবচেয়ে ভালো লেখা চাই, সবচেয়ে সুন্দর চিন্তা, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, তা দর্শনের ক্ষেত্রে হোক, ধনবিজ্ঞানের ব্যাপারে হোক, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়ে হোক, যিনি সবচেয়ে উপযুক্ত তাঁকে দিয়ে লেখাতে হবে, সেই লেখক বা মনীষীকে চিনি বা না চিনি যায় আসে না, কোনো সূত্র ধ'রে তাঁর কাছে পৌছুতে হবে, তিনি যদি লিখতে সম্মত না হন, ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে হবে, আজ রাজি না হ'লে কাল হয় তো হবেন, নয় তো তাঁকে ছয় মাস সময় দেওয়া হোক। 'চতুরঙ্গে'র প্রথম কুড়ি বছরের বাঁধানো সংখ্যাগুলি যদি কারো কাছে থাকে, পেড়ে দেখতে পারেন, ইতিমধ্যে-প্রতিষ্ঠিত-তথা-বিখ্যাত লেখকদের নামের পাশাপাশি আরো-অনেক নতুন নাম, সে-নামগুলি তখন বিখ্যাত ছিল না, কিন্তু 'চতুরঙ্গ' উপযাচক হয়ে সুযোগ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিল ব'লেই এখন তারা বিখ্যাত। চল্লিশের দশকের উপান্তে, নাটকের প্রকৃতি এবং প্রকরণ নিয়ে তুখোড় চিন্তা করছেন তখনো-অল্পখ্যাত শম্ভু মিত্র, নাসিরুদ্দিন রোডের অপরিসর ফ্ল্যাটে, পাকড়াও তাঁকে, প্রতি সংখ্যায় তাঁকে লিখতেই হবে কী ক'রে হঠাৎ জরাজীর্ণ বাংলা দেশে নবনাট্যের জাদুস্পর্শ ছোঁওয়া দিয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলের দোতলার কুঠুরিতে, নয় তো জাদুঘরের কোনো গুপ্ত সুড়ঙ্গে, ধরো গিয়ে নীহাররঞ্জন রায়কে, তাঁকে দিয়ে নিয়মিত চিত্রকলার উপর লেখাতে হবে। সাহিত্যিক থেকে যিনি হঠাৎ চলচ্চিত্রপরিচালকে পরিণত হয়েছেন, জ্যোতির্ময় রায়, তিনি লিখুন তাঁর নতুন নেশা নিয়ে সংখ্যার-পর-সংখ্যা ধ'রে, নয় তো সিনেমা-আন্দোলন নিয়ে যিনি উৎসাহে টগবগ করছেন লিখুন সেই চিদানন্দ দাশগুপ্ত। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখুন শিশুসাহিত্য নিয়ে, নয় তো রেডিও প্রসঙ্গে। সত্যজিৎ রায় তখন প্রাক্-'পথের পাঁচালী', তাঁকে উপরোধ ক'রে প্রতি বছর 'চতুরঙ্গে'র নতুন প্রচ্ছদ, এবং ভিতরে কোন্ প্রবন্ধ-কোন্ কবিতা-কোন্ গল্প কীভাবে বিন্যাস করা হবে, তা নিয়ে প্রায়ই, হয় তো, দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ।

উপরে যে-বর্ণনা করা হলো তা অবশ্যই ইতিহাস, পুরোটা না হ'লেও, যার অনেক-কিছুর আভাস এখন অনেকেরই জানা। কিন্তু অন্তত দুটি প্রসঙ্গ আলাদা ক'রে উল্লেখ না-করলে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। আরো অনেকের আগে, জীবনানন্দ দাশকে যে-সম্মান 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল, তা গভীর দ্যোতনাময়। বিশেষ ক'রে আমি 'সাতটি তারার তিমিরে'র মুহূর্ত মনে আনতে চেষ্টা করছি। জীবনানন্দর সন্ধ্যাভাষায় প্রবেশ করতে গিয়ে অনেকেই তখন ব্যর্থ, এমনকি 'কবিতা' পত্রিকা পর্যন্ত প্রায় মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ায় উপক্রম করেছে, কিন্তু আতোয়ার রহমানের নিষ্ঠা আদৌ বিচলিত হয়নি। বোঝবার অক্ষমতার দায়িত্ব তিনি কবিকর্মের অসাফল্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু সেই দৃঢ়চিত্ততার কোনো স্বাক্ষর ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে না।

অপর যে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করা সমান প্রয়োজন তা আতোয়ার রহমানের অস্থির উৎকণ্ঠা বাংলা সাহিত্যের প্রকোষ্ঠকে পৃথিবীর অলিন্দের সঙ্গে মেলানোর জন্য। আজ থেকে পঁয়তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার প্রতি ঋতুতে সায়ংকালীন একটি পরিচিত দৃশ্য, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়, নয় তো হগ মারকেট অঞ্চলের বইয়ের দোকানগুলিতে, আতোয়ার রহমানের উদ্‌ভ্রান্ত প্রব্রজ্যা ; বিদেশ থেকে নতুন কী বই এলো, নতুন কোন্ সাহিত্যপত্রিকা, যা আলোচনার যোগ্য, 'চতুরঙ্গে'র পাঠকদের সঙ্গে যার পরিচয় ঘটানো যথাশীঘ্র কর্তব্য। মেনে নেওয়া ভালো, 'পরিচয়' পত্রিকার মধ্যবর্তিতায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার আগে থেকেই, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সুশোভন সরকার-ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু 'চতুরঙ্গে' সাহিত্যের আন্তর্জাতিক চেতনা আরো যেন ব্যাপ্ততর, গভীরতর হলো, অন্তত ঐ মধ্যচল্লিশের বছরগুলি থেকে ষাটের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত। বাংলা সাহিত্যে এই পৃথিবীচেতনা বর্তমানে প্রায় নির্বাপিত। গাঁজাভাঙচরসের সমানুভূতিতে, আজ থেকে বছর কুড়ি আগে, শেষ একটি তরঙ্গ আমাদের উপকূল ছুঁয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার নিছক সাহিত্যিক প্রেরণা, সন্দেহ হয়, অতি সামান্যই ছিল। এবং সেজন্যই, এই এতগুলি বছরের সেতু পেরিয়ে, নতুন ক'রে বিস্ময়াবিষ্ট হ'তে হয় এটা মনে ক'রে কী একরোখো উৎসাহে আতোয়ার রহমান এঁকে ধ'রে অরওয়েলের সদ্য-প্রকাশিত-হওয়া বইয়ের আলোচনা ছাপছেন, ওঁকে ধ'রে নেরুদা কি এলুয়ারের কোনো কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করছেন, নয় তো আন্তর্জাতিক সমস্যাকে আরো ঘোরালো ক'রে তোলা

কোনো সদ্য-লিখিত-কিন্তু-তন্মুহূর্তে-বিখ্যাত প্রবন্ধ কাউকে দিয়ে টাটকা বাংলা ক'রে 'চতুরঙ্গে'র পরবর্তী সংখ্যার প্রথম রচনা হিশেবে সাজাচ্ছেন। হয় তো সেটা ১৯৫২ সাল, নয় তো দু-এক বছর আগে কি পরে, দিল্লি-প্রবাসী হুমায়ুন কবির তখনও পোশাকি অর্থে পত্রিকার সম্পাদক, আলবার্তো মোরাভিয়ার দুই গণিকা নিয়ে এক অপখ্যাত গল্প চিদানন্দ দাশগুপ্তকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে আতোয়ার রহমান ছাপিয়েছেন, দিল্লি থেকে সম্পাদকের কুপিতা সহধর্মিণী অজস্র ভর্ৎসনাবাণী পাঠাচ্ছেন, কিন্তু আতোয়ার রহমান নির্বিকার, প্রথাগত শ্লীলতাবিচারের বাইরে তাঁর উৎকর্ষান্বেষণ, উপস্থিত মুহূর্তের আলোড়ন তো একদিন থিতিয়ে যাবে, কিন্তু যা শ্রেষ্ঠ, তা টিঁকে থাকবে।

অন্য যে-কথা উল্লেখ করার সুযোগ খুঁজছি আমি, তা-ও এখানেই বলা যেতে পারে। ঘরের ভিড় কেটে গেলে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন, রাজনীতি-জীবনদর্শনের দিক থেকে আপাতবিচারে যাঁর সঙ্গে আমার কোনো মিলই নেই, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর এতটা সমীপবর্তী আমি হলাম সামাজিক কোন্ রসায়নের রহস্যে? আতোয়ার রহমানের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ছাত্র-আন্দোলন উপলক্ষে, আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে: তখন মতাদর্শের সাযুজ্য-সাযুজ্য-হীনতা যেখানেই থাকুক না কেন, দুই মেরুর দিকেই ক্রমশ আমরা ভ্রমণ ক'রে গেছি, আমার প্রবল ও ক্রমবর্ধমান কমরেড স্টালিন-আসক্তি, তাঁর মতো গোড়ার-দিকে-ঘোর-ত্রৎস্কীভক্ত, পরে-টিটো-অনুরাগী, আরো-পরে-দেশের-সব-চেয়ে-পচনশীল-রাজনৈতিক-শক্তির ছায়াশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ না হয়েই পারে না। কিন্তু সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে আতোয়ার রহমানের অবিকল মানসিকতা 'চতুরঙ্গ'কে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে ঘিরে রেখেছিল। সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা-নিয়মকলার মধ্যে এটিও একটি ঘটনাক্রম, যা ইতিহাসের নিয়ম মেনেই নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে: একটি বিশেষ সময়পরিধি, তার পরিধার মধ্যে এক ধরনের সহাবস্থান, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, যেখানে আচার্য নরেন্দ্র দেবের প্রবন্ধের পাশাপাশি দামোদর কোসাম্বীর লেখা ছাপা হচ্ছে, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের টিপ্পনির পাশে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার গা ঘেঁষে সুভাষ মুখোপাধ্যায়-উত্তর কোনো বিপ্লবী কবির সর্বশেষ রচনা।

তা ছাড়া, সামাজিক-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের বাইরেও কতগুলি সত্য থেকে যায়, যারা ইতিহাসচেতনার প্রসঙ্গে ঠিক উৎক্ষিপ্ত না হ'লেও পুরোপুরি সংপৃক্তও নয়। আতোয়ার রহমানের বাঙালিচেতনা নিয়ে ঈষৎ আলাদা ক'রে মন্তব্য

সংযোজন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের চরিত্রের মধ্যে কোথাও একটি বিশেষ দার্ঢ্য থাকে, দিনের কোলাহলে তার পরিচয় চট ক'রে পাওয়া সম্ভব নয়। যে-সময়ে আতোয়ার রহমান মধ্যজীবনে প্রবেশ করছিলেন, ইচ্ছা করলেই দেশভাগের পর পাকিস্তানে চ'লে গিয়ে জাগতিক অর্থে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন; ঘটনাচক্রে এমনিতেই তাঁর অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন ওপার বাংলার সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ একাত্ম ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু আতোয়ার রহমান নিজের জাত্যভিমানের সঙ্গে সে-ধরনের একটি জীবনকলা মেলাতে পারেননি। মানুষকে মানুষ হিশেবে আমরা শ্রদ্ধা জানাই, অথবা অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, কারণ তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, বাছাই করতে হয়, সিদ্ধান্তহীনতাও একপ্রকার বাছাই। আতোয়ার রহমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের মায়া কাটিয়ে যে-কলকাতা শহর সেই কিশোরবয়স থেকে তাঁকে লালন করেছে, তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ক্রান্তির লগ্নে। বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতি, বাঙালি পরিবেশ, কলকাতালগ্ন যে-পরিবেশ, হাওয়া, জল, আকাশ, কবিতার কণা, রাজনীতির গুঞ্জন, গুজবের কলকোলাহল, পরনিন্দা-পরচর্চা, আশা অথবা আশাহীনতা, আনন্দ-নিরাসক্তি, ঝড়বৃষ্টিঝাপটা, একটু-একটু-ক'রে ধুঁকে-মরা কিন্তু তারই মধ্যে বেঁচে থাকা, স্বপ্ন-দেখা-ভালো-লাগা-ভালোবাসা : এই সামগ্রিক মানসিক আবহকেই আমরা প্রেম বলি, সেই অর্থে আতোয়ার রহমান নিখাদ প্রেমিক ছিলেন, কারণ আনুগত্যই প্রেম।

এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক আনুগত্য, যা ফুটে বেরোয় পারস্পরিক বিনিময়-প্রতি-বিনিময়ে, আড্ডার সৌরভে, দৈনন্দিক জীবনযাপনের সহস্র অভিজ্ঞতার নির্যাসে। শেষ পর্যন্ত হয় তো যে-কোনো সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পূর্ণতম পরিচয়ের প্রমাণ হিশেবে টিঁকে থাকে সেই আন্দোলন-জড়ানো আড্ডার স্মৃতি। আতোয়ার রহমানের কথা বলতে গিয়ে আমাকেও তাই সব শেষে আড্ডার প্রসঙ্গে চ'লে যেতে হয়, 'চতুরঙ্গে'র আড্ডা, যা আতোয়ার রহমানেরই আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠান। প্রতিটি আড্ডাই অনুষ্ঠান, কিন্তু আগে থেকে যার কোন ধরা-বাঁধা কর্মসূচী থাকে না, যা হয়ে যায়, একটি বিশেষ সৃষ্টির আদল পায়, যে-মানুষগুলি আড্ডা দিচ্ছেন তাঁদের চরিত্রগুণে। 'চতুরঙ্গে'র আড্ডায় 'চতুরঙ্গে'র সাহিত্যাদর্শই প্রতিফলিত হতো। সকালের আড্ডা, দুপুরের আড্ডা, বিকেলের আড্ডা : গণেশচন্দ্র এভিনিউর ফ্ল্যাটের সংলগ্ন ফ্ল্যাটে অধিষ্ঠিত 'পূর্বাশা' পত্রিকা, সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য তথা প্রকাশক সত্যপ্রসন্ন দত্ত—যিনি, কে আর মনে

রেখেছে সেই ঐতিহাসিক কথা, 'কবিতা' পত্রিকারও প্রথম প্রকাশক ছিলেন— সুতরাং, মাঝে-মাঝেই, 'পূর্বাশা'র আড্ডাও গড়িয়ে পড়তো 'চতুরঙ্গে'র আড্ডার শরীরে, বিচিত্র নানা প্রসঙ্গ, বিচিত্রতর মানুষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে শুরু ক'রে সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে অশোক মৈত্র, কমল মজুমদার থেকে সুভো ঠাকুর, অরুণকুমার সরকার-নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী থেকে ঐ মুহূর্তের কনিষ্ঠতম কবিযশঃপ্রার্থী, চতুর্থ আন্তর্জাতিক-অনুরক্ত সাংবাদিক ইন্দ্রদত্ত সেন থেকে তৎকালীন সর্বরসভোক্তা সুরঞ্জন সরকার। সেই আড্ডায় নরক গুলজার ছিল, অশ্লীলতা-অভব্যতা ছিল, কিন্তু, সেই সঙ্গে, আশ্চর্য প্রতিজ্ঞাও ছিল, আশ্চর্য প্রতিশ্রুতি ছিল, যে-প্রতিশ্রুতি, নিয়ম মেনেই, কিংবা না-মেনেই, সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হত। সারা জীবন নিজে একছত্র না লিখেও আতোয়ার রহমান সেই আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন, অতএব ঐ সৃষ্টির গৌরব-গরিমা-অহংকারের অধিকার তিনি দাবি করতে পারতেন, উচ্চস্বরেই করতে পারতেন।

কিন্তু করেননি কখনো, কারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিচরণ করেছেন ব'লেই হোক, অথবা স্বভাবপ্রতিভাজাত প্রজ্ঞার ফলেই হোক, আতোয়ার রহমান জানতেন সাহিত্য সমষ্টিগত সৃষ্টি, কীর্তির সাফল্য ভাগ ক'রে নিতে হয়, ছাপাখানা থেকে প্রুফ আনা-ছাপাখানায় প্রুফ ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব যে-কর্মচারীর উপর, আড্ডায় চা জোগায়-টিকিয়া ভেজে দেয় যে-গৃহভৃত্য, সাহিত্যসৃজনে তারাও সমান সহকর্মী, 'চতুরঙ্গ' মিলিত সংসার। সে-সংসারে আতোয়ার রহমানের সঙ্গে যুক্ত মানিক মুখোপাধ্যায়ও, মুহম্মদ আতিকুল্লাও।

বাঙালির সাহিত্যসংস্কৃতি গত দুই দশক ধ'রে ধুঁকছে, সামাজিক-আর্থিক সংকটের সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক সংকটের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক অস্বীকার করা অসম্ভব। সার্বিক কাতরতার রাহু 'চতুরঙ্গে'র উপরও প্রভাব ফেলতে বাধ্য, সে-প্রভাব যথানিয়মে প'ড়েও ছিল। আতোয়ার রহমানের কিছু-কিছু ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের সঙ্গেও অপ্রতিরোধ্যভাবে 'চতুরঙ্গে'র ভবিষ্যৎ জড়িয়ে পড়েছিল: যে-পত্রিকা একটি বিশেষ মানুষের ব্যক্তিত্বের শাণিত প্রকাশ, তার ক্ষেত্রে এটা না হয়েই পারে না। সেই ঋতুতে আতোয়ার রহমানকে অনেকগুলি ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিতে হয়েছিল। সর্ব অর্থে যে-মানুষ শৌখিন ছিলেন, তাঁকে পৃথিবীর সঙ্গে নানা ধরনের বোঝাপড়া করতে হয়েছিল, ছাঁটতে হয়েছিল অনেক শখ, অনেক সংগোপন স্বপ্নকে স্বল্লায়তনে, নতুন ক'রে, সীমিত সংস্থানের মধ্যে, সাজিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। অতীতে যাঁরা দীপ্ত-উচ্ছল-অস্তি-

জাতনাসা আতোয়ার রহমানকে তাঁর কৃতিত্বের শিখরে দেখেছিলেন, এই বিশেষ ঋতুতে তাঁরা অনেকেই ছিলেন না। থাকলে অবধারিত হতচকিত হয়ে যেতেন। কিন্তু আতোয়ার রহমানের মনে কোনো গ্লানি ছিল না। শেষ পর্যন্ত, হয় তো তিনি এই নিষ্কম্প সিদ্ধান্তে নিজেকে স্থিত করেছিলেন, মানুষের পৌরুষ প্রমাণিত হয় তার চিত্ত-অবৈকল্যে, আমাদের জীবন নিয়ে আমরা কতগুলি পরীক্ষা করি, দ্যূতক্রিয়াপ্রতিম কতগুলি ঝুঁকি নিই, সিদ্ধান্তে পৌঁছই, পছন্দ করি, যার পরিণামে-প্রবহমানতায় কোথাও-না-কোথাও উত্তীর্ণ হই আমরা, সেটা মরু-বিজয়ের স্বর্ণশিখরও হ'তে পারে, কিন্তু অন্যথা পরাভবের সায়াহ্নমুহূর্তের উপত্যকাও হ'তে পারে, কিন্তু মানুষের চরিত্রমাহাত্ম্যের প্রমাণ এই অভিজ্ঞান মেনে নিতে পারার মধ্যে, মেনে নিয়ে, আপাতত পরিপার্শ্বের সঙ্গে সুষমসম্পর্ক স্থাপনান্তে, ফের নতুন ক'রে স্বপ্ন দেখার মধ্যে।

আতোয়ার রহমান মেনে নিতে পেরেছিলেন। আমাদের মতো অল্প কয়েকজন, যাঁরা, একটু কাছে থেকে, একটানা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে তাঁকে দেখে এসেছিলাম, স্থিতপ্রাজ্ঞ এই আতোয়ার রহমানকে আরো অনেক নিবিড় ক'রে পেয়েছিলাম যেন শেষের কয়েক বছর। আমরা প্রত্যেকে আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসে-আদর্শে স্থিত আছি, থাকবো ; আমরা জানি আজ থেকে চল্লিশ বছর কি তারও আগে, যে-স্বপ্নগুলি দেখতে শুরু করেছিলাম, যে-আকাশকুসুম মনের সংগোপনে জড়ো করেছিলাম, তারা দ্বিপ্রহরের নির্দয় প্রহারে মিলিয়ে গেছে-ঝ'রে গেছে-রূপান্তরিত হয়ে গেছে ; আমাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যগুলি হয় তো এখনো তেমনই আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে এই উপলব্ধিতে গিয়ে এখন ঠেকেছি উপলক্ষগুলির প্রকৃতির-চেহারার একটু অদল-বদল ঘটলে ক্ষতি নেই তাতে, এটুকু বোঝাপড়ায় যদি আমরা রাজি না হই, আত্মপ্রবঞ্চনা হবে তা ; কারণ অভিজ্ঞতাই আমাদের শিখিয়েছে, আমাদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে, পৃথিবীর-জীবনের নিয়মই এটা, ছায়া পড়বেই, এমনকি যাঁকে সফলতম পুরুষ ব'লে মনে হয়, তাঁর ক্ষেত্রেও পড়ে, পড়বেই।

অহংকারী মানুষ ছিলেন আতোয়ার রহমান, কিন্তু তাঁর অহংকারবোধই তাঁকে এই প্রজ্ঞায় পৌঁছে দিয়েছিল। জীবনে সার্থকতার অনেকগুলি দিক আছে : যে-সমরে আমি পরাস্ত, কেন একমাত্র তার স্মৃতিই শুধু আমাকে অহরহ পুড়িয়ে মারবে, যে-যুদ্ধে আমি বিজয়ী, আমার যে-সাফল্য অবিসংবাদিত, তাদের প্রসঙ্গ কেন অনুত্থাপিত থাকবে? সংবাদপত্রের উগ্র বিঘোষণা ইতিহাস নয়,

ইতিহাস রচিত হয় তাৎক্ষণিকের মাদকতা ঈষৎ ঢ'লে পড়ার পরই, সুতরাং নিজেকে সংবৃত ক'রে এনে আপাতত অন্তরঙ্গতার প্রসঙ্গে মগ্ন হওয়াটাই শ্রেয়, প্রেমপ্রীতিবাৎসল্য-পারস্পরিক অঙ্গীকারের মধ্যেও এক গভীর-আশ্চর্য মানবিক চরিতার্থতা, সেই চরিতার্থতার স্বাদ থেকেই বা আমরা নিজেদের বঞ্চিত করবো কেন ?

ইতিহাসের ধোপে কী টি`কবে কী টি`কবে না, তার প্রাগ্‌নির্ণয় অসম্ভব। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা একটি বিশেষ ঋতুর একটি বিশেষ বাঙালি মানসের পরিচয় বহন করবার দায়িত্ব নিয়েছিল কয়েক দশক ধ'রে : বাঙালি সাহিত্যবোধ, বাঙালির সংস্কৃতিবোধ, বাঙালির রুচি, বাঙালির সৌন্দর্যতত্ত্ব। বাঙালিমানসের অহমিকা-বোধ আতোয়ার রহমানের ব্যক্তিগত অহমিকাবোধের সঙ্গে মিলে গিয়ে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকাকে রূপ দিয়েছিল। এবং সেজন্যই, আতোয়ার রহমানের মৃত্যুর সাত বছর পর, আমার এই উৎকীর্ণ পীড়াবোধ। বর্তমান মুহূর্তের পরিপার্শ্ব যতই শীৎকার-সমাচ্ছন্ন হোক, আর্যাবর্তের সমুৎপন্ন ক্লেদ যতই আমাদের বিবমিষাযুক্ত করুক, কী ক'রে এটা ভুলবো আমাদের সংস্কৃতিশিল্পসৌন্দর্যবোধ, আমাদের ভাষা-জ্ঞানের মতোই, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেখা, আমরা ব্রাত্য হবার আন্তরিক ভাণ করলেও আমাদের চেতনার ঐতিহ্য রাশ টেনে ধরবেই। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ইঙ্গিতে একটি পরিমিতিবোধের কথা বাঙালিদের শেখাতে চেয়েছিলেন : ফুরায় যা দে রে ফুরাতে। ওই একই কথা ঘুরিয়ে বলেছিলেন অমিত রায়ের জবানিতে : ফজলি আম ফুরোলে বলবো না আনো ফজলিতর আম। 'চতুরঙ্গে'র অস্তিত্বকে যাঁরা প্রতি বছর বারোটি টুকরো ক'রে জাহির করতে চাইছেন, আমার বিবেচনায় আতোয়ার রহমানের স্মৃতির নির্মম শবব্যবচ্ছেদ করছেন তাঁরা। ত্রুটিহীনতার উপাসক ছিলেন আতোয়ার রহমান, নিখুঁতকে কী ক'রে নিখুঁততম করা যায়, সেই চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত-শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষটি তাঁর জীবদ্দশায় সামর্থ্যের-সাহসের প্রত্যন্তে গিয়ে 'চতুরঙ্গ'-সংক্রান্ত এই ব্যভিচারকে প্রতিহত করতেন। 'চতুরঙ্গে'র ডালপালাকে খসাতে দিতেন না তিনি, যদি মাসিক সাহিত্যসংস্কৃতি পত্রিকা বের করবার তাগিদ বোধ করতেন, তা হ'লে 'দ্বাদশ সম্ভার' বা ঐ ধরনের অন্য-কোনো নামে করতেন, চুয়াল্লিশ বছর ধ'রে লালন করা একটি সোনালি স্বপ্নকে এভাবে মুগুর হেনে গুঁড়িয়ে দিতেন না। মন্তব্যগুলি রূঢ়, কিন্তু পৃথিবীতে কিছু-কিছু অবিমৃষ্যকারিতাকে মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, ময়মনসিংহ শহরের রেলস্টেশনে, ভাদ্রমাসের

এক ভ্যাপসাগরম মধ্যরাত্রিতে, আতোয়ার রহমানের সঙ্গে আমার আকস্মিক পরিচয়, যে-পরিচয় কী ক'রে এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে পরিণত হয়েছিল। সাত বছর হলো আতোয়ার রহমানের মৃত্যু ঘটেছে, আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিশেষ-একটি শূন্যতা, কিন্তু, 'চতুরঙ্গ' নিয়ে যে-বীভৎসতা দৃষ্টান্তিত হ'তে দেখছি, তাতে এই শূন্যতাবোধ ছাপিয়ে যে-অন্যতর অনুভূতিতে উদ্বেলিত হবার আকুলতা অনুভব করি, তা অবসাদবোধ, এবং অবসাদবোধজনিত আত্মগ্লানি। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে আতোয়ার রহমানকে তো বাঁচিয়ে রাখতে অসমর্থ হয়েইছি, কিন্তু তাঁর স্মৃতিকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে অসফল হলাম। নিজে আর যে-ক'টা দিন বাঁচবো, এই গ্লানি নিয়েই বাঁচতে হবে।

'জলাভূমির কবিতা' ?

অমুক গুরুর তমুক ভক্তশিষ্য একশো তেইশ বছর আগে ঠিক কবে কত তারিখে কোন্ বাগানবাড়িতে দিব্যদর্শন করেছিলেন, তা পর্যন্ত প্রতিদিন খবরের কাগজে বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। কিন্তু, তা হ'লেও, একদেশদর্শী সমাজ আমাদের, অন্য অনেক জরুরি ইতিহাস তলিয়ে যায়। সুতরাং তেমন কী লাভ এটা জোর ক'রে মনে করিয়ে দিয়ে যে আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বেরোতে শুরু করেছিল? কিংবা সেই সঙ্গে এটা যোগ ক'রে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স তখন? 'পুতুলনাচের ইতিকথা' অবশ্য সৃষ্টি হিশেবে তলিয়ে যায়নি, যেতে পারে না। বাঙালিদের অশিক্ষার ঋতু শেষ হ'লে, হয় তো আজ থেকে দশ বছর বাদে, অথবা কুড়ি বছর বাদে, নয় তো আরো যোজন-যোজন সময়ের সীমা অতিক্রম ক'রে, যতদিন বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে, 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় বঙ্গভাষীকে ফিরতেই হবে, কারণ, ভেবেচিন্তেই বলছি, বাঙালির সাহিত্যকর্ম. গদ্যের পরিষদে, যদি কোথাও মহত্ত্ব ছুঁয়ে থাকে, তা এই গ্রন্থে। কিন্তু এই প্রত্যয়োক্তি শোনবার জন্য বর্তমান মুহূর্তে ক'জনের আগ্রহ? সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রিকা একাকার হয়ে গেছে, কিস্তিবন্দী হয়ে সেখানে মুম্বাইয়ের বাঘা-বাঘা ফিল্মি নায়কদের জীবনচর্চা তথা জীবনদর্শন নিয়ে ভারি-ভারি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' নিয়ে সময় নষ্ট করবার তাদের অবকাশ কোথায়? উপন্যাসটি রচিত হবার এই অর্ধ-শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার বছরে, আলাদা ক'রে বাজারে তা পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা পর্যন্ত আমার জানা নেই। যদি পাওয়াও যায়, কৌতূহল রইলো বৎসরান্তে খোঁজ নেবো সাকুল্যে ক'টি কপি গোটা বছর ধ'রে বিক্রি হলো। আজ থেকে আটাশ বছর আগে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত আত্মহনন, মাঝে-মাঝে

সন্দেহ হয়, সম্ভবত এই কারণে যে তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, জানতেন জাতি হিশেবে আমরা কোন্ অধঃপাতের দিকে এগোচ্ছি।

নিশ্চয়ই ভুল বলা হলো। অন্তত 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় বিষাদাশ্রিত যে-বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, তা অগ্রসরমান সর্বনাশের নয়, স্থবির-নিশ্চল পঙ্ককুণ্ডের : 'রোগে ভুগিয়া অকারণে মরিয়া ওরা বড় আনন্দে থাকে। স্ফূর্তি নয়—আনন্দ, শান্ত স্তিমিত একটা সুখ। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, প্রচুর জীবনীশক্তির সঙ্গে ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য। ওরা প্রত্যেকে রুগ্ন অনুভূতির আড়ত, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ওদের মনের বিস্ময়কর ভাঙা-গড়া চলে, পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা : ভাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াশা, শ্যামল শৈবাল, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা, কলমি ফুল, সতেজ উত্তপ্ত জীবন ওদের সহিবে না।'

তবে কি 'পুতুলনাচের ইতিকথা' রূপকাহিনী, গাওদিয়া গ্রাম, সাংকেতিক বাঙালিসমাজ, যে-সমাজের মানসিকতার সারাৎসার পঞ্চাশ বছরেও সামান্যতম পরিবর্তিত হয়নি, যুদ্ধ-দেশভাগ-সহস্র সামাজিক-আর্থিক সংকট-রাজনৈতিক উপপ্লব-অপপ্লাবন সত্ত্বেও না? 'সতেজ উত্তপ্ত জীবন' নয়, একই বিন্দুতে নিরুৎসুক, নিঃসাড়, থুবড়ে প'ড়ে থাকা? আমাদের ঘিরে সমগ্র পৃথিবী এগোচ্ছে, আমরা স্থিত আছি, থাকবো, আত্মকলহে দীর্ণ, আত্মম্ভরিতার কুম্ভিপাকতৃপ্ত, অপাপবিদ্ধ-উর্ধ্বহিতাহিত? 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কি নিছক এই ইঙ্গিত দিচ্ছে? তাই কি, উপস্থিত সামাজিক অনুশাসন যা-ই হোক না কেন, আমি সম্মোহিত-আবেগমূক, বার-বার এই উপন্যাসে ফিরে-ফিরে যাই, আমার সেই দশ বছর বয়স থেকে শুরু ক'রে? এবং প্রতি বারই, আমার দশ বছর বয়সে, সতেরো বছর বয়সে, উদ্দাম পঁচিশ বছর বয়সে, ঈষৎ-সংহত মধ্যতিরিশে, চল্লিশোর্ধ্বের সায়াহ্ন-শঙ্কিত মুহূর্তে, এবং এই ষাটের কাছাকাছি শুদ্ধ প্রহরে, একই প্রত্যয়ে নিজেকে সান্ত্বনা জানাই : শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে? বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যদি কোনো সৃষ্টিকে ধ্রুপদচিহ্নিত করতে হয়, যে-ধ্রুপদের প্রধান চরিত্রলক্ষণ শেষের পরেও শেষহীনতার আশ্বাস, তা 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এবং তার কারণ কি এই যে আমরা গাওদিয়া গ্রাম অতিক্রম ক'রে নিকষ সাম্প্রতিকতায় অতি অবলীলার সঙ্গে চ'লে আসতে পারি? টাইপ নিয়ে গল্প, টাইপ কী ক'রে তৈরি হয় তা নিয়ে উপন্যাস, এই প্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে-সঙ্গে এটাও অনুধাবন করতে পারি, নিশ্চল পঙ্ককুণ্ডের মধ্যেও এক প্রবহমানতা আছে, স্থাবির্যের প্রবহমানতা, বাঙালিসমাজের প্রকৃতিগত কাঠামো

অনড় থেকেছে এই পঞ্চাশ বছর ধ'রে, এটাই তা হ'লে বাঙালি নিয়তি, পুতুলনাচের নিথড় ক্রীড়নক আমরা, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ছি, পরনিন্দা-পরচর্চা করছি, কিন্তু নিষ্ক্রমণ অসম্ভব, পালাতে পারছি না, সুতোর জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারছি না, শশী ডাক্তারের মতো প্রস্থানের সমস্ত আয়োজন আমরা বাতিল ক'রে দিই, তারপর একদিন পুরোপুরি নির্বাপিত হয়ে যাই? 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সর্বশেষ বাক্যযোজনা : 'মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না', তা হ'লে কি ধ'রে নিতে হবে এই নিবে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া, নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই বাঙালি সমাজের নির্বাণ? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়, তা-ই বলতে চেয়েছিলেন? বর্তমানের অক্ষম কুম্ভিপাকই ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথগীকরণের বাইরে, আমরা যে-যেখানে আছি, সেখানেই থাকবো? তাই কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায়-অমোঘ আত্মহনন মাদকবিষের অববাহিকা ব্যবহার ক'রে?

কিন্তু, ধ্রুপদের এটাও তো চরিত্রলক্ষণ, সমন্বয়হীনতাকে পরম্পরায় বিধৃত করা। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' নিয়ে তর্ক জুড়তে ব'সে, শশী-কুসুমের আপাত নিস্ফল উপাখ্যানকে কেন বাড়তি প্রাধান্য দেবো, কেন মতি-কুমুদের বেপরোয়া দুঃসাহসকে কম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করবো? কখনো-কখনো সন্দেহ হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কাছেই হেরে গিয়েছিলেন, যে-দ্বন্দ্বই জীবন, যে-দ্বন্দ্ব যে-কোনো ধ্রুপদী সৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেই দ্বন্দ্বের পরাক্রমে তিনি বিধ্বস্ত হয়েছিলেন, হয়েছিলেন ব'লেই তাঁকে স্বীকার করতে হলো 'জীবন-যাপনের প্রচলিত নিময়-কানুন', পুতুলনাচের ব্যাকরণ, কুমুদ-মতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কুমুদ-মতির কাহিনী, অকপটে তাঁকে মেনে নিতে হলো, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় 'প্রক্ষিপ্ত'।

তা ছাড়া, শশীর বাবা গোপাল দাস? সুদখোর গোপাল দাস, অত্যাচারী গোপাল দাস, হয়তো বা ব্যভিচারী গোপাল দাস, সংসার সম্পর্কে যার এত মমতা, সম্পত্তির প্রতি এত লোভ, যে-লোভ আসক্তির অধিক, সেই মানুষও হঠাৎ, শশীকে অবাক ক'রে দিয়ে, সেনদিদির ছেলে, যা সম্ভবত তার জারজ সন্তান, অথবা তা-ও না, তাকে সঙ্গে ক'রে উধাও হয়ে গেল। 'সেই যে গেল গোপাল আর সে ফিরিল না। সংসারী গৃহস্থ মানুষ সে, সমস্ত জীবন ধরিয়া ফলপুষ্পশস্যদাত্রী ভূমিখণ্ড, সিন্দুকভরা সোনা রূপা, কতকগুলির মানুষের সঙ্গে

সামাজিক সম্পর্ক দায়িত্ব বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি যত কিছু অর্জন করিয়াছিল সব সে দিয়া গেল শশীকে, মরিয়া গেলে যেমন সে দিত'। এটাও কি পুতুলনাচ? ঢোঁক গিলতে হবে এ-ধরনের কোনো ব্যাখ্যা মেনে নিতে হ'লে যে নিয়তি আমাদের বাধ্য করে, নিয়ন্ত্রণ করে, গোপাল দাসের অকস্মাৎ-নিষ্ক্রমণ নিয়তি-বিধান, অতএব পুতুলনাচেরই অন্যতর দৃষ্টান্ত। বরঞ্চ, এই উক্তি কি ঘোর দুস্পর্ধা হবে, গোপাল দাস-শশীর পিতা-পুত্র সম্পর্ক ধ্রুপদী দ্বান্দ্বিকতারই প্রকাশ, এই দ্বন্দ্বে শশীর পরাজয় তার পিতার কাছে, এবং, হয় তো, সেই সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের যে-সম্পাদ্য, তারও পরাজয়? জীবনের জটিলতা ক্রীড়নকবৃত্তি পেরিয়ে, মানুষ নিঃসাড় নয়। মানুষের প্রক্রিয়ায় বুদ্ধির পাশাপাশি আবেগ আলোড়ন তোলে, বিবেক এবং ষড়রিপুর মধ্যে সতত সংঘাত, এই সংঘাতের উপসংহারে কে কোথায় পৌঁছবো তা বহিঃপ্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত, এই অনুশাসন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলি কিন্তু মানেনি। যদি কেউকে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র প্রেক্ষিতে, পরাজিত নায়ক ব'লে অভিহিত করতে হয়, তা হ'লে তা সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই করতে হয়। অথচ এই উপন্যাসে যা ঘটলো তা লেখকের পরাভব ব'লে অভিহিত করাও মনে হয় ঠিক হবে না, তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তের বন্ধন থেকে তাঁর চরিত্রগুলি মুক্তি পেল, কিন্তু তাদের মুক্তি দেওয়া হ'লো ব'লেই তো তারা নিজেদের নির্ধারিত ভূমিকা ছাড়িয়ে যেতে পারলো, এটাই তো উপন্যাস, যেখানে টাইপ কী ক'রে টাইপ হয় তা-ই শুধু ব্যক্ত হয় না, টাইপ কী ক'রে পাল্টে যায়, পাল্টে গিয়ে অন্য টাইপে পরিণত হয়, তা-ও সমান স্বচ্ছতার সঙ্গে উচ্চারিত হ'তে পারে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মহত্ত্ব, আমার বিবেচনায়, এখানেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাসক্তি শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে এই গ্রন্থে। চরিত্রগুলি পুত্তলীবৎ আচরণ করতে রাজি নয়, এটা আঁচ করতে পেরেছিলেন তিনি, তাঁর অহমিকা তাদের সোহম্‌সত্তার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, দাঁড়াতে দেননি তিনি। নন্দ এবং কুন্দ, সেনদিদি ও যামিনী কবিরাজ, যাদব পণ্ডিত ও পাগলদিদি, প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের নিহিত তথা পারস্পরিক দ্বান্দ্বিকতার সূত্র মেনে নিয়ে এগিয়েছে। 'ভিন্‌দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন লাজরক্ত হইলা কন্যা পরথম যৌবন', তা সত্ত্বেও যদি কুসুম ও শশীর সম্পর্কের পরিণতি সামাজিক প্রথাসংস্কার-অনুশাসন অতিক্রম ক'রে শেষ পর্যন্ত কোনো উদ্ধত ইতিবৃত্ত রচনা করতে অপারগ হলো, সেই অসাফল্যের ব্যাখ্যা কিন্তু অন্যত্র নয়। প্রকৃতির অঙ্গুলিহেলনে

অথবা সামাজিক অনুশাসনে নয়, কুসুম-কর্তৃক শশীর প্রত্যাখ্যান কাহিনীর প্রবহমানতারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ : কেউই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, না শশী, না কুসুম, মানুষ, যে-কোনো মানুষ, পুরুষ, নারী, পরিবেশ তার মানসিকতায় ছায়া ফেলে, ঘটনাক্রম ফেলে, সে-মানুষ বহু-বিবিধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিক্রমণ ক'রে, পরিভ্রমণ ক'রে টিঁকে থাকে, টিঁকে থাকে অথচ বদলেও যায়। এই টিঁকে থাকা তাই পরিবর্তনেরও ইতিকথা, প্রতি মুহূর্তে মানুষ, নারী, পুরুষ, পাল্টে যাচ্ছে, না পাল্টে উপায় নেই তার। এটা তো নিয়তি নয়, বিবর্তন, দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতজনিত বিবর্তন। যে-কুসুম একরাশ মিছে কথা ব'লে কাজের মানুষ শশীকে আটকে রাখতো, অকারণে তালবনে নিয়ে গিয়ে প্রলাপ বকতো, যে-কুসুম একদিন শশীর এমনকি পরোক্ষ, চকিত কোনো ইঙ্গিতে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পর্যন্ত তার সঙ্গে চলে যেতে সদাপ্রস্তুত ছিল, সেই কুসুমের ইতিকথা : 'স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম। চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহায় গড়া যে চিরকাল সে একরকম থাকবে বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না'।...'লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না?...সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে'।

আমরা কাতর বোধ করতে পারি, পৃথিবীর-সমাজের না-মেলা অঙ্কের জন্য, অবরুদ্ধগতি কবিতার জন্য, মন খারাপ হ'তে পারে আমাদের, তবু এই চরিত্রগুলিকে নিঃসাড়, অনড়, পরাগত ক্রীড়নক ব'লে অভিহিত করবো কোন যুক্তিতে? এরা সচল, এরা চিন্তা করে, চিন্তা ক'রে প্রেম নিবেদন করে, প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, চিন্তা ক'রে হিংসায় লীন হয়, ফন্দি ফাঁদে, মমতায় কাঁদে, ভীরুতায় কুঁকড়ে আসে। কোন্ সংজ্ঞার সংস্থানে দাঁড়িয়ে তা হ'লে জীবনের এই জমকালো জটিলতার ইতিবৃত্তকে উপন্যাসকার পুত্তলীনৃত্য হিশেবে বিবেচনা করেছিলেন? সব মানুষ তাদের সম্ভাবনায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না, তা মিলনের সম্ভাবনাই হোক, বা বিরহেরই হোক, কিংবা বিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থারই হোক। আমাদের স্বপ্ন এবং আমাদের বিচরণের মধ্যবর্তী অলিন্দে ছায়া নামে, লম্বা ছায়া, সরু ছায়া, বাঁকা ছায়া, এমন ছায়া যা চকিতে এসে চকিতেই মিলিয়ে

যায়। কিছু-কিছু ছায়া, তাদের সমস্যা ও অভিশাপ, সম্ভবত কাকতালীয়, অথবা নেহাৎই অভাবনীয় দুর্বিপাকের ফলশ্রুতি, কিন্তু অন্য-অনেক ছায়াই আমাদের স্বকীয় সৃষ্টি, মৌলিক রচনা, নয় তো পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে তাদের উদ্গমবীজ নিহিত। যদি স্তম্ভিত প্রত্যয় নিয়ে বলাবলি করি, আমাদের প্রেম-অভিমান ভুল-বোঝা বিদ্বেষ-হিংসা অনুরাগ-অভিমান কোনো-কিছুরই নিয়ামক আমরা নিজেরা নই, কোনো বহির্বিধাতা নির্দেশ দিচ্ছেন, আমরা আমাদের ভূমিকা পুতুলের মতো পালন ক'রে যাচ্ছি, তা হ'লে অবশ্য সমস্ত বির্তকই শিকেয় তুলে রাখতে হয়, মানুষের প্রপঞ্চপ্রদাহযন্ত্রণা নিয়ে যে-কোনো অভিজ্ঞানচর্চা অহেতুক সময়ক্ষেপণ ব'লে ঘোষণা করতে হয় তা হ'লে, 'পুতুল-নাচের ইতিকথা'র শুরু যেখানে—'খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন'—এই উপাখ্যানের সমগ্র বৃত্তান্ত, তা হ'লে ধ'রে নিতে হয়, ঐ ধরনের কটাক্ষপাতসঞ্জাত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, জোর দিয়েই বলা চলে, আদপেই তা ছিল না।

ব্যক্তিবিশেষের, কিংবা ব্যক্তিসমষ্টির, আচরণকলার নিয়ামক কে তা হ'লে? যে-মুহূর্তে সমষ্টির প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি, সমাজের সংস্থানে চ'লে আসছি আমরা। মানুষ, নারী, পুরুষ, তারা সবাই সমাজের অংশ; তাদের বাদ দিয়ে সমাজ নয়, কিন্তু, প্রতীপ উক্তিও সমান—কিংবা হয়তো আরো-একটু বেশি—সত্য: সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিমানুষের কোনো ভূমিকা নেই। আমাদের প্রেম-নিবেদনে, প্রেম-প্রত্যাখ্যানে, প্রেম-বিস্মৃতিতে আমাদের মানসিকতার-স্নায়ুতন্ত্রী-আবেগপ্রবাহের প্রতিভাস, কিন্তু আমাদের মানসিক গঠন, আমাদের বোধ, আমাদের আবেগপ্রক্রিয়া, সমস্ত-কিছুর উপর তো সেই সঙ্গে সামাজিক বিন্যাসের প্রভাবও সমান ওজনে পড়তে বাধ্য। সমাজকে এড়ানো অসম্ভব। তর্কের মুহূর্তে মুখ দিয়ে ইচ্ছামৃত্যুর তিথি-তারিখ হঠাৎ বেফাঁস ঘোষণার বার্তা গ্রামময় র'টে যাওয়ার ফলে যাদব পণ্ডিতকে শেষ পর্যন্ত সায়ানাইড খেয়ে নির্ধারিত দিনে মৃত্যুবরণ করতে হয়; অন্যথা সামাজিক পরিবাদের ভয়। সমাজ একটি বিশেষ সংস্থানে দাঁড়িয়ে আছে ব'লেই অভিসারে-আসা কুসুমকে শশীর সতর্ক ক'রে দিতে হয়, ঘুম থেকে উঠে দাওয়ায় গোপাল দাস বিশ্রামরত, সুতরাং কুসুমকে আর-একটু দাঁড়িয়ে যেতে হবে। হয়তো সমাজ আছে ব'লেই, তার যে-জারজ শিশুকে জন্ম দিয়ে সেনদিদি মারা গেলেন, কিংবা যে-শিশু আসলে জারজ না-ও

হ'তে পারে, কিন্তু যেহেতু সমাজের ধারণা অন্য, নিজের পুঞ্জিত অপরাধবোধের তাড়নায় গোপাল দাস সেই শিশুকে নিয়ে কাশী চ'লে যায়। সমাজ আছে ব'লেই কুন্দ তার নেশাচ্ছন্ন চেতনার নিরিখে যাচাই ক'রে এটা বুঝতে পারে: স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে তার ফেরার কোনো উপায় নেই, তাকে নন্দর রক্ষিতা হিশেবেই আমৃত্যু থাকতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে প্রসিদ্ধি দিয়েছেন, সেই জীবনদেতা আসলে সমাজরূপী দেবতা। বহুবিধ উপচারে তাঁকে প্রত্যক্ষ তুষ্ট করবার প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রেখেও বলা চলে, এই দেবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আমাদের জীবনযাপনের নিয়ামক মানুষ-ঠাসা, মানুষের-অনুশাসনে-ঠাসা এই সামাজিক পরিবেশ। মানুষের সঙ্গে সমাজের এক জটিল-অদ্ভুত উভমুখী সম্পর্ক। মানুষ, নারী, পুরুষ, তাদের নিয়ে সমাজ, তারাই সমাজের নিয়ামক, মানুষের হিংসা, মানুষের সংস্কার-কুসংস্কার, মানুষের পরশ্রীকাতরতা, মানুষের অলৌকিকে আস্থা, মানুষের লোকলজ্জা : এই অণু-পরমাণুগুলির সংমিশ্রণই সামাজিক পরিবেশ ; যে-সমাজকে আমরা সৃষ্টি করি সেই সমাজই কিন্তু অতঃপর আমাদের জীবনধারার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। দু'টি আপাতবিচ্ছিন্ন ওজস্, কখনো পাশাপাশি, কখনো মুখোমুখি, কখনো এগোচ্ছে, অথবা দাঁড়িয়ে থাকছে, পরস্পরের সঙ্গে কখনো মিশে যাচ্ছে, অথবা পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে, আবার নিজেদের আলাদা ক'রে নিচ্ছে, ব্যক্তি-মানুষের মানসিকতা, সামাজিক মানসিকতা, একে অপরকে গড়ছে, একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এক আশ্চর্য উভপাক্ষিক সম্পর্ক। শশী-কুসুম-মতি-কুমুদ-সেনদিদি-পাগলদিদি-যামিনী কবিরাজ-যাদব-পণ্ডিত-কুন্দ-নন্দ-সিন্ধু-গোপাল দাস-কৃপানাথ, এক অর্থে সবাই, পুত্তলীবৎ, সমাজের নির্দেশে নিজেদের পরিচালনা করছে, যে-অর্থে সমাজ নিয়ামক, ব্যক্তি-বিশেষ, পুতুলনাচের প্রতিম, নড়ছে-দুলছে-চলছে-নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ছে। যিনি উপন্যাসকার, তিনি তাঁর আসক্তিহীনতা নিয়ে ব্যক্তিমানুষের আকুতি-উদ্বেগ-আস্ফালন-স্বপ্নকামনা-স্বপ্নভঙ্গ সব-কিছু নিরীক্ষণ করছেন, ব্যক্ত করছেন, বিশ্লেষণ করছেন, বিবৃত করছেন ; যেহেতু তিনি নিজে ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত, তাঁর কাছে সামগ্রিক সামাজিক আকরটি খুব স্পষ্ট ধরা পড়ছে, চট্ ক'রে তিনি বুঝে নিচ্ছেন, বোঝাতে চাইছেন যদিও কোনো-কিছুই—কুসুম-শশীর পারস্পরিক অনুরাগ, যামিনী কবিরাজের হৃদয়যন্ত্রণা, সেনদিদি-গোপাল দাসের রহস্য, তাল-পুকুরে গা-উদলা-ক'রে মতির ভরদুপুরে স্বপ্ন দেখার মুহূর্তে কুমুদের আবির্ভাব, একটার-পর-আরো-একটা ঘটনার সমারোহ—অসার নয়, তাৎপর্যহীন নয়,

জীবনের ধন, যথার্থই, কিছুই যাবে না ফেলা, তা হ'লেও সব-কিছুর মধ্যেই, সব-কিছুকেই জড়ো ক'রে নিয়ে একটি যন্ত্র কাজ করছে, সেই যন্ত্রের নিয়মকলা সামাজিক নিয়মকলা, সেই যন্ত্র সমাজ, যাকে আলাদা ক'রে চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না, যে বৈদেহী, অথচ যার সর্বব্যাপী ঘোর সবাইকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে, সকলের বোধকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে, প্রত্যেকের প্রতিটি আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র এটাই অন্তঃস্থিত নির্যাস।

'পুতুলনাচের ইতিকথা', অনেকে তবুও বলবেন, শেষ পর্যন্ত বিষাদকাহিনী। মতি-কুমুদের অকুতোভয় অধ্যায়টি পাশে সরিয়ে রাখলে, শেষ পর্যন্ত প্রায় সবাই-ই যেন যে-সামাজিক অনুশাসন দুশ্চ্ছেদ্য, তার কাছে বন্দিত্বপ্রাপ্ত, সমস্ত আবেগ-ক্রোধ-অভিমান-আস্ফালন সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেরই অনুশাসনের বৃত্তে ফেরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে, অনেকে অতএব উপসংহার টানবেন, শুধু নিরাসক্ত নন, নিরাসক্তিবিলাসী, যেন নিরাসক্তিতেই লেখক হিশেবে তাঁর নির্বাণ। আমরা তাই, অনেকে যোগ করবেন, অভিভূত হই, জীবনের আপাত-প্রাগ্‌নিরূপিত প্রাব্রজ্যে বিষণ্ণ বোধ করি, কিন্তু তৃপ্তি পাই না যেন, ব্যক্তিমানুষ এত অসহায়, এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারি না, পরিপ্রশ্নের প্রহারে জর্জরিত হয়ে ফিরি।

পূর্বোচ্চারিত ধুয়ো আর-একবার উচ্চারণ করতে হয়, শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে। সমাজ তো দ্বন্দ্বমূলক দ্বন্দ্বঅধ্যুষিত প্রস্থানভূমি; একটু আগে যা বলা হয়েছে, সমাজবিন্যাসের ছাপ মানুষের চেতনাকে গড়ে, কিন্তু মানুষকে আমরা অন্য প্রাণীর থেকে আলাদা করি নিছক এই কারণে যে সে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার যে-সংজ্ঞাআচরণবিধি সমাজের কাছ থেকে পাওয়া, তার শৃঙ্খল ভেঙে অন্য-এক স্তরে নিজেকে টেনে তুলতে পারে। পারে ব'লেই সমাজ বিবর্তিত হয়, সে-বিবর্তন স্বয়ংক্রিয় নয়, মনুষ্যসাধিত; যে-মানুষ ক্রীড়নক, অতি সহজেই সে বিধাতা হয়ে উঠতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাসক্তি অবশ্যই এই আস্তিকতাবোধবর্জিত নয়, শশী চরিত্রের দ্বিমুখী প্রবণতার বিশ্লেষণে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কোথাও কার্পণ্য নেই: 'বস্তু আর বস্তুর অস্তিত্ব এক হইয়া আছে আমাদের মনে। কখনো কি ভাবিয়া দেখি মানুষের সঙ্গে মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার কোনো সম্পর্ক নাই? মানুষটা যখন হাসে অথবা কাঁদে তখন হাসি কান্নার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলি মানুষটাকে: মনে মনে মানুষটার গায়ে একটা লেবেল আঁটিয়া দিই—সুখী অথবা দুঃখী। লেবেল আঁটা দোষের নয়। সব

জিনিসেরই একটা সংজ্ঞা থাকা দরকার। কে হাসে আর কে কাঁদে এটা বোঝানোর জন্য দু-দশটা শব্দ ব্যবহার করা সুবিধাজনক বটে। তার বেশি আগাই কেন? কেন পরিবর্তন চাই? নিঃশব্দে অশ্রু মুছিয়া আনিতে চাই কেন সশব্দ উল্লাস? রোগ শোক দুঃখ বেদনা বিষাদের বদলে শুধু স্বাস্থ্য বিস্মৃতি সুখ আনন্দ উৎসব থাকিলে লাভ কিসের?' এই দ্বান্দ্বিক প্রশ্নমালায় কিন্তু শশীর উৎকণ্ঠা মিলিয়ে যায় না : 'ভাবিতে-ভাবিতে রীতিমত বিহ্বল হইয়া যায় বই-কি শশী! সে রোগ সারায়, অসুস্থকে সুস্থ করে। অথচ একেবারে চরম হিশাব ধরিলে শুধু এই সত্যটা পাওয়া যায় : রোগে ভোগা, সুস্থ হওয়া, রোগ সারানো, রোগ না-সারানো সমান—রোগীর পক্ষেও শশীর পক্ষেও। এসব ভাবিতে-ভাবিতে কত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে শশীর জাগে। রহস্যানুভূতির এ-প্রক্রিয়া শশীর মৌলিক নয় : সব মানুষের মধ্যে একটি খোকা থাকে যে মনের কবিত্ব, মনের কল্পনা, মনের সৃষ্টিছাড়া অবাস্তবতা, মনের পাগলামিকে লইয়া সময়ে অসময়ে এমনিভাবে খেলা করিতে ভালোবাসে'।

এখানেই কিন্তু মানুষের পুত্তলীবৎ আচরণ-বিচরণের উপসংহার; মানুষের 'কবিত্ব', মানুষের 'কল্পনা', মানুষের স্পর্ধা ও সাহস, আপাতত যা অবাস্তব তাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে, মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে চ'লে যায়, মতি-কুমুদের ক্ষেত্রে যা দৃষ্টান্তিত, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় সে-কাহিনী উহ্য, প্রক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তালবনের প্রান্তে যে-মাটির টিলা, বর্ষাতে জঙ্গলে ঢেকে যায় তা, জঙ্গল ভেদ ক'রে শশীর সে-টিলার উপর উঠে সূর্যাস্ত দেখার শখ: 'দিগন্তের কোলে তরুশ্রেণী যে বাঁকা রেখাটি রচনা করিয়াছে তাহারই আড়াল হইতে দেখিবে সূর্যকে'। অথচ এই ঈপ্সামোচনের মধ্যেও ছায়া পড়ে, কোনো আনন্দই অবিমিশ্র নয়, কোনো অভিজ্ঞতাই দ্বন্দ্বরহিত নয় : 'টিলার উপর উঠিয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া সে যখন দাঁড়াইল তখন তাহার মন শান্তিতে ভরিয়া আছে। আগামী জীবনের যত ভাল কাজ তাহাকে করিতে হইবে তাহা সম্পন্ন করিবার শক্তিতে সহজ বিশ্বাস আছে, সাহস আছে। কিন্তু সূর্য ডুবিবার আগে শশী ভীত হইয়া পড়িল। ছেলেবেলা মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়া এক-একদিন তাহার কেমন ভয় করিত, তেমনি ভয়। শরীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যৎ তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে, স্তরে স্তরে সাজানো ভয়ের তলে প্রোথিত পৃথিবীর উর্ধ্বে, একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাটির টিলার শীর্ষে শশী হঠাৎ হারাইয়া

গিয়াছে। সামনে রূপ-ধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, শশী জানে না ; কিন্তু আর কখনো নিশ্বাস সে লইতে পারিবে না'। এই বর্ণিত অনুভূতি সৃষ্টির-কর্মের-অনুভবের-অনুরাগের দ্বন্দ্বসঞ্জাত, যে-মানুষ 'রূপ-ধরা অনন্ত'কে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনা সম্ভব তা প্রমাণ করতে চায় তাকে এই দ্বন্দ্বের উপত্যকা পেরোতেই হবে। এটাই মানুষের উপাখ্যান, যে-উপাখ্যানের কোনো শেষ নেই। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ইতি টেনেছেন এই বৃত্তান্তে যে গ্রাম্য শশী ডাক্তার, যে-কুসুমকে নিয়ে যেখানেই হোক উদ্ধত পাড়ি দিতে একদা প্রলুব্ধ হয়েছিল, প্রতিজ্ঞ ছিল 'রূপ-ধরা অনন্ত'কে স্পর্শ করবে, পরাজিত-পরাভূত-নিয়মলাঞ্ছিত সে, মাটির টিলার উপর উঠে সূর্যাস্ত দেখার শখ তার আর এ-জীবনে আসবে না, কিন্তু শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শেষ পংক্তিতেও তিনি শেষ কথা বলেননি, বলা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আমরা, কিন্তু আমাদের এই সততনিয়ন্ত্রিত সত্তাও তো অহরহ নিয়ন্ত্রণ পেরিয়ে চ'লে আসে। কোনো অধ্যায়ই, এমনকি ব্যাকরণ-ঘোষিত শেষ অধ্যায়ও, শেষ অধ্যায় নয়। বিশেষ-একটি ক্রান্তিমুহূর্তে শশীর মানসিকতার যে-প্রকাশে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ইতি, সেই মুহূর্ত তো আপেক্ষিকতার আকস্মিকতা, ইতিহাস তারও পর আরও রচিত হবে, শশী ডাক্তারের ইতিহাসও ওখানে থেমে থাকবে না। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কুমুদ-মতির পরবর্তী কাহিনী প্রক্ষিপ্ত, শশীর কাহিনীও কিন্তু সমপ্রক্ষিপ্ত।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, নিরাসক্ত-নিরাভরণ গদ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গাওদিয়ার গণ্ডি-ঘেরা সমাজের কৌটোয় নারী, পুরুষ, মানুষের আবর্তিত ইতিহাসকে বিধৃত করেছিলেন, যে-ইতিহাসের শেষ নেই। সেই ইতিহাসের বিন্যাস, একজন উপন্যাসকারের পক্ষে, একমাত্র রূপক হিশেবেই পরিবেশন করা সম্ভব। রূপক তার কাজ সারা ক'রে ক্ষান্ত হয়, যে-প্রতীক তার দায়ভার, তাকে উজ্জীবিত করে। রূপকের কর্তব্য বিশেষের মধ্যে অবিশেষকে জড়ো ক'রে আনা, ব্রহ্মাণ্ডের মর্মকথাকে পদ্মবিন্দুতে থরোথরো, অথচ নিটোল, উপস্থাপন। এখন আমাদের ধাঁধা লাগে, গাওদিয়ার ঐ মানুষগুলির ইতিকথা সময়ের বাধা দীর্ণ ক'রে, ভূগোলের পরিখা ভেঙে, অন্য কালের অন্য স্থানের, না কি সব কালের, সব অঞ্চলের মানুষগুলির ইতিকথা নয় কি ? 'পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা'। এই 'ওরা', কারা তারা, গাওদিয়ার ঐ মানুষগুলি, না কি আমরা, এই

পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আসা বাঙালি সমাজের মানুষগুলি ? ‘সতেজ উত্তপ্ত জীবন’ কাদের সইবে না, কাদের নিয়ে এই নির্মম মন্তব্য ? শশীর মনোভঙ্গ, মাটির টিলার উপর উঠে সূর্যের বিচ্ছুরিত লীলা দেখার শখ এ-জীবনে আর না-উদিত হবার মতো ভয়ংকর ঘটনাসম্পাত, কোন্ সমাজের নির্জীব স্থবিরতার অভিজ্ঞানে? যে-সৃষ্টিকর্ম ধ্রুপদের লক্ষণযুক্ত তা ত্রিকালদর্শী, আমাদের তাই ধোঁকা লাগে, সব-কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু ত্রিকালদর্শনের কষ্টিপাথরের বিচারেই শেষ পর্যন্ত আমাদের ভুল ভাঙে, পৃথিবীর ইতিকথার শেষ নেই, মানুষের ইতিকথার শেষ নেই, শশী-কুসুমের ইতিকথারও শেষ নেই। এবং নেই ব'লেই, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র সমাপ্তির পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আস্তিকতায় শপথ নিতে হয় ফের, অথবা লোকপ্রবাদঘটিত সংশয় ঘোচাবার জন্যই নিতে হয়, কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখান তিনি। ইতিকথা শেষ হয়ে যায়নি, জলাভূমির কবিতাকে বেগবতী মহাকাব্যে পরিণত করা চলে, তার প্রাগ্‌প্রমাণ হিশেবেই যেন পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন তিনি : আমি কমিউনিস্ট, সমাজকে নতুন ক'রে গড়া যায় এই প্রতীতিতে আমি অঙ্গীকৃত, যে-পুতুলরা নাচে, তাদের নৃত্যে যে-অমিত ঐশ্বর্যের অঙ্কুর, তার দিকে তাকিয়ে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র স্রষ্টাকারের যেন বিস্ময়ের সীমা নেই।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, ছাব্বিশ বছর বয়সের এক যুবক নির্লিপ্ত গদ্যে, আপাতনিরুত্তাপ আবেগে, অবৈকল্যসিদ্ধ বুদ্ধিতে যে-রচনায়, কীসের তাগিদে কে জানে, হাত দিয়েছিলেন, বাংলাভাষার সাতশো বছরের শিলাঙ্কিত ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আমাদের সাহিত্য আপাতত সাংবাদিকতায় নিক্ষিপ্ত-নিপতিত, সামনের দিকে তাকিয়ে নির্ণয় করা মুস্কিল কোথায় গিয়ে পৌঁছবো আমরা। তবে নরককুণ্ডেও যদি আমাদের উপনীত করা হয়, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ সান্ত্বনা হয়ে থাকবে ; অমরত্বের অধিকার, হয়তো ন্যায়সঙ্গত কারণেই, আমাদের নেই, কিন্তু অমরত্বের প্রকোষ্ঠে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, আমাদের পৌঁছে দিয়েছিলেন।

'কবিতাই একমাত্র তলোয়ার ও ঢাল'

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি সাহিত্যভোক্তাদের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। করেছেন, করছেন, ক'রে চলেছেন। এবং ক'রে চলেছেন বছরের-পর-বছর ধ'রে, একটু-একটু ক'রে, এবং যদি এখন, এই মুহূর্তে, তাঁর কীর্তির প্রস্তরগুলিকে এক সঙ্গে জড়ো ক'রে দেখা যায়, অবাক না হওয়া অসম্ভব। বাঙালি কূপমণ্ডুক, অজ্ঞতাজনিত দাম্ভিকতায় সমাচ্ছন্ন : অল্প নিয়ে সুখে থাকার দাম্ভিকতা, যা হীনমন্যতারই প্রতিভাস। 'পরিচয়'-'চতুরঙ্গ' পর্বে, আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, কিংবা তারও খানিক আগে, আরো কুড়ি-তিরিশ বছর পিছিয়ে, কিছু সময় 'সবুজপত্রে'র মধ্যবর্তিতায়, কিছু সময় 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কারো-কারো ব্যক্তিগত ঝোঁকে, বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা ঘটেছে থেকে-থেকে। খুব-একটা সফল হয়নি সে-সব চেষ্টা। প্রধান কারণ, বাঙালি মানসিকতার পাশাপাশি যা উল্লেখ করতেই হয়, ঔপনিবেশিক ভূত। আমাদের বিশ্বদর্শন ইংরেজি ভাষানির্ভর হ'তে বাধ্য ছিল সেই স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যায়ে। ইংরেজিতে যে-যে জিনিশ অনূদিত হয়নি, আমাদেরও তাই তাদের নির্যাসে আস্বাদিত হবার কোনো সুযোগ ছিল না। যেহেতু ইংরেজিতে নেই, আমরাও অতএব সে-রসে বঞ্চিত : এই স্বতঃসিদ্ধ বেড়ার নিগড়ে আবদ্ধ থেকেছি আমরা। অথচ নিজেদের দুরবস্থা নিয়ে তেমন যে চিন্তিত ছিলাম আমরা, তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

স্বাধীনতার পর এই অবস্থা পাল্টানো উচিত ছিল, বিদেশী যোড়শোপচারে আমাদের খাদ্যপাত্র উপচে না-পড়াটাই বিস্ময়জনক ছিল, আরোপিত শৃঙ্খল থেকে তো মুক্ত হয়েছিলাম আমরা। অথচ, পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত হিশেব নিয়ে দেখুন, পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টে বিচার করুন, প্রকাশন-সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলুন, বাংলা সাহিত্যের কূপমণ্ডুক দিনের অবসান তো

হয়ইনি, বরং আরো যেন কূপের গভীরে আমরা ডুবে যাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের একটি ছোট তত্ত্ব আছে, সভয়ে সেটা ব্যক্ত করি। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে বিদেশী বাক্‌সরস্বতীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বরাবরই সবচেয়ে উৎসাহী ভূমিকা পালন করেছেন বামপন্থীরা। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ আন্তর্জাতিক আদর্শ, সব দেশের শ্রমজীবী মানুষকে জড়িয়ে অমরাবতীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে-সুন্দর-নিটোল-মহৎ চিন্তা, তা যদি সব দেশেই ছড়িয়ে দিতে হয়, তা হ'লে পরস্পরকে জানতে হবে, বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের সহকারশাখার উপর নির্ভর ক'রে বেড়ে উঠবে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধ। অতএব জানো, চেনো, পরস্পরের সাহিত্য পড়ো, পরস্পরের সাহিত্য থেকে অনুবাদে মহা উৎসাহে হাত লাগাও। আমি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বুদ্ধদেব বসুদের কথা ভুলে যাচ্ছি না, তাঁদের বৈদেশিক কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে উন্মুখতার প্রতীপ প্রেরণা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, কিন্তু প্রেরণা থেকেই তো প্রতীপ প্রেরণারও উৎস। গত পঁচিশ-তিরিশ বছর ধ'রে বামপন্থী সাহিত্যআন্দোলন সব-মিলিয়ে আমাদের দেশে, এবং বিশেষ ক'রে আমাদের পশ্চিম বাংলায়, তথা কলকাতায়, অথচ অনেকখানি ঝিমিয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্তর্লীন সমস্যার সঙ্গে এই অবসাদগ্রস্ততার নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে, সে-ব্যাপারে কোনো মন্তব্যপ্রয়োগের উপস্থিত প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নিরুৎসাহ হ'তে হয়, সুতরাং কী আর হবে, নিজেদের গুটিয়ে আনো, নিজেদের নিয়েই ব্যাপৃত থাকো, কূপমণ্ডুক সমাজব্যবস্থা, কূপমণ্ডুক সামাজিক আন্দোলন। অনুবাদ-সাহিত্যে আর মুক্তি নেই, চর্বিতচর্বণরূপ আত্মরতিতেই আপাতত দিনযাপন: এই মানসিকতার শিকার এখন আমরা অনেকেই।

এবং সেজন্যই মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাতে হয়। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে স্থিত থেকে এমন কতগুলি কাজ তিনি ক'রে চলেছেন যা বাঙালির উপস্থিত মনোভাবের প্রেক্ষিতে প্রায় অভাবনীয় ব'লে মনে হ'তে পারে। সামগ্রিক পরিবেশ যা-ই হোক না কেন, আমরা পৃথিবীর নাগরিক, আমাদের চিন্তার প্রতিভাস অন্যত্র ছায়া ফেলবে, অন্য দেশ-মহাদেশের চিন্তার-আবেগের-বুদ্ধির-কুশলতার অনুরণন আমাদেরও স্পর্শ ক'রে যাক, একটু দোলায় দুলি আমরা। সামগ্রিক আবহাওয়া যতই কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হোক না কেন, চেনা-অচেনায় মেশা বহু বিদ্যুৎলতা এখনো হাজার ঝড়ের বুকে চঞ্চলতা

ঘটিয়ে যায়, যাচ্ছে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই নিজের কর্তব্যের একটি তালিকালিপি, অন্তত মনে-মনে, তৈরি ক'রে আস্তে-আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা, গত কয়েক বছরে, পর-পর অনুবাদের আস্বাদ পেয়েছি স্পানিশ থেকে, জর্মন থেকে, হাঙ্গেরিয়ান তথা বিভিন্ন স্লাভ সাহিত্য থেকে; দূরের আকাশ যে আসলে দূর নয়, আমাদেরই আকাশ, আমাদেরই আশা-হতাশা-রাগ-ক্রোধ-ভয়-প্রতিজ্ঞা-অঙ্গীকারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে শিহরিত, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন তিনি তা। যে রাঁধে সে চুলেও বিনুনি রচনা করে; মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বহুব্যস্ত অনুবাদকর্মের পাশাপাশি অধ্যাপনা করছেন, ক্রিকেটের উপর বই, এমন কি উপন্যাস পর্যন্ত, লিখছেন, কিশোরসাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, লিমেরিকের উৎসসন্ধানে যাত্রা করছেন, এই সকলকলাপারঙ্গম মানুষটি স্বতঃসিদ্ধতার মতো আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন, কিন্তু তা ব'লে নিছক মামুলি কৃতজ্ঞতা জানানোর সৌজন্যটুকুও যেন আমরা বিসর্জন দিয়ে না বসি।

কৃতজ্ঞতা উজাড় ক'রে নিবেদন করার সুযোগ নতুন ক'রে আমাদের কাছে এসেছে। অনুবাদে 'মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা'* পরিবেশন ক'রে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবার আমাদের সত্যি-সত্যি গুণগত এক নতুন অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দিলেন। হোলুব চেকোস্লোভাকিয়ার কবি, জীবিকা তথা ব্রতের বিচারে বৈজ্ঞানিক, রসায়ন ও প্রাণিতত্ত্বের মধ্যবর্তী অলিন্দে গবেষণাচর্চা ক'রে থাকেন, কিন্তু বাঁচার তাগিদে কবিতা লেখেন; মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসাদে তাঁর সৃষ্টিকর্মের যে-পরিচয় আমরা পেলাম, কবিতা, অথচ ঠিক যেন কবিতা নয়, যেন পুঞ্জ-পুঞ্জ অগ্নিখণ্ড। স্বীকার করতে কোনো সংকোচই নেই আমার, এই অভিজ্ঞতার কোনো পূর্বসূরী নেই।

বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়েই একটু আলাদা ক'রে আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে করছি: হোলুবের ভাষা, প্রসঙ্গ, তথা বিভঙ্গ। কবিতার ভাষা নিয়ে আমাদের, বাঙালিদের, কিছু-কিছু সংস্কার মজ্জাগত। তোমায় সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে কেয়ূরে-কঙ্কণে কুঙ্কুমে-চন্দনে: অলঙ্কার-পুষ্পভারে কবিতা নিষ্পেষিত-জর্জরিত হবে, এই ধ্যানধারণা তো চট ক'রে মিলিয়ে যাওয়ার নয়। স্পষ্ট ক'রে বললে আত্মাভিমানে ঘা লাগবার আশঙ্কা, কিন্তু বাংলা কাব্যের

* মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা। অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। কুড়ি টাকা।

ইতিহাস মোটামুটি গত একশো বছরের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের পরিণতি থেকে আজ পর্যন্ত। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যে যে-বিবিধ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হাজার বছরের ব্যাপ্তিতে বিকশিত হয়েছে, বাংলা কবিতা ততগুলি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য মাত্র এই একশো বছর পেয়েছে। যদি গহনতম গভীরে প্রবেশ করতে চাও, কবিতাকে যদি আদিম অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিশেবে ব্যবহার করতে চাও, কাব্যের ভাষাকে তা হ'লে নিরাভরণ ক'রে আনতে হবে, নিরাভরণ, নিরাবরণ, সজ্জার-অলংকরণের দুঃসহ ভার থেকে মুক্ত হ'তে হবে, ভাষা যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, ভাষা যাতে বিভ্রান্ত না করে। ভাষাকে শাণিত হ'তে হবে, দীপ্ত হ'তে হবে। কিন্তু কী ক'রে তা সম্ভব যতক্ষণ না সমস্ত খোলস পরিত্যক্ত হয়েছে, সাজের পোশাক সমস্ত বিসর্জিত হয়েছে? কবিতার ভাষাবিবর্তনের ইতিহাস এই নির্মোক মুক্ত হবার ইতিহাস। বাংলা কবিতার দুর্ভাগ্য, হাতে খুব কম সময় মিলেছে, মাত্র একশো বছর, তাই আমাদের এখনো ঈষৎ হতচকিত ঘোর, আমাদের সংস্কারে এখনো জড়ত্ব, অলংকারমোহ উত্তীর্ণ হ'তে পারলেই যে কবিতা, সেই যুক্তিতে এখনো আমাদের ইতস্তত সংশয়। সরলতার দিকে কবিতাকে এগোতেই হবে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও শেষ পর্যন্ত এই প্রতীতিতে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে শারীরিক অসামর্থ্যই হয় তো নির্বাণের রূপ নিয়ে এসেছিল, নইলে রূপনারায়ণের কূলে এমন সহজিয়া প্রজ্ঞায় পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব হতো।

হোলুবের ভাষা তাই আমাদের ধাক্কা দেবে। এই ভাষায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নেই, এবং একমাত্র প্রয়োজন সংযমের, সরলতার। এই ভাষায় আমরা কথা বলি, গাল পাড়ি, পরচর্চা করি, নিকশ, আটপৌরে। এই ভাষা মানে প্রাত্যহিকতা। এবং তার বেশি সত্যিই যে কোনো প্রয়োজন নেই তা-ও স্পষ্ট : মানবিক বোধ তথা অভিজ্ঞানের সবচেয়ে জটিল জিনিশগুলি আসলে সবচেয়ে সোজা, তাদের নিয়ে কবিতা রচনা করতে গেলে তাই ভাষাকেও পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে আসতে হয়। আমার সন্দেহ, এই অতীব গূঢ় অথচ অতীব সহজ কথাটি বোঝানোর জন্যই হোলুবের নিম্নলিখিত কবিতা :

আলবের্ট আইস্টাইন আলোচনা করিতেছিলেন—
(কী বলিতে হইবে, তাহা আবিষ্কার করাকেই তো
বলে জ্ঞান)—আলোচনা করিতেছিলেন পল ভালেরির

সঙ্গে,
জিজ্ঞাসা শুনিলেন :
হের আইনস্টাইন আচ্ছা, আপনি আপনার
চিন্তাদের লইয়া কী করেন ? মাথায় গজাইবা মাত্র
লিখিয়া ফ্যালেন ? নাকি সন্ধ্যাবেলা অব্দি
অপেক্ষা করেন ? কিংবা সকাল অব্দি ?

আলবের্ট আইনস্টাইন উত্তর দিলেন :
মঁসিয় ভালেরি, আমাদের ব্যবসায়ে
চিন্তারা এতই দুর্লভ
যে যখন কারু মগজে কোনো চিন্তা উদয় হয়
আপনি কিছুতেই তাহাকে ভুলিতে পারিবেন না।
এমন কী এক বছর পরেও না। ('আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিষয়ে', পৃ. ৯৭)

কিংবা নিচের এই স্পষ্ট, সাবলীল ঘোষণা কান পেতে শুনুন :

যদিও কবিতা জেগে ওঠে তখন, যখন আর-কিছু করার
নেই ; যদিও কবিতাই শৃঙ্খলাসৃষ্টির শেষ চেষ্টা, বিশৃঙ্খলা
যখন অসহনীয়।
যদিও কবিরা তখনই সবচেয়ে জরুরি হয়ে ওঠেন, যখন
স্বাধীনতা, খাদ্যপ্রাণ গ, যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রচারযন্ত্র,
নানা বাধানিষেধ ও জরুরি অবস্থা এবং অতি-উত্তেজনা-
সারানো চিকিৎসারও সবচেয়ে প্রয়োজন ; যদিও শিল্পী
হওয়া মানেই ব্যর্থ হওয়া আর শিল্প ব্যর্থতারই বশম্বদ —
যেমন বলেছেন স্যামুয়েল বেকেট ;
কবিতা, তবু, মানুষের শেষ কাজগুলির নয়, প্রথম
কাজগুলির অন্যতম। (পৃ. ৬৫)

কবিতা মানুষের শেষ কাজগুলির নয়, প্রথম কাজগুলির অন্যতম : এই ভয়ংকর সত্য হোলুব অতি স্বাভাবিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করেন, করতে পারেন, কারণ

তাঁর চেতনার অভ্যাসের সঙ্গে এই সত্যভাষণ ওতপ্রোত জড়িত। সত্যের এই ভাষণ অনাড়ম্বর, কারণ সত্য নিজেই অনাড়ম্বর, অনাড়ম্বরতাই তাকে সৌন্দর্যে পৌঁছে দেয়। সৌন্দর্যে যে পৌঁছে দেয় তার প্রমাণ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত হোলুবের এই অনুবাদ শুরু করবার মুহূর্তে আঁকড়ে ধরে, প্রায় এক নিঃশ্বাসে পুরো বইটি প'ড়ে শেষ না করা পর্যন্ত মুক্তি নেই। অনুবাদ-গ্রন্থটির উপসংহারে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রক্ষাকবচ' হিশেবে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন: হোলুবের রচনা কি কবিতা, না প্রতিকবিতা? প্রথাগত ব্যাকরণের বাইরে যে-কাব্যের উৎসৃষ্টি-উন্মোচন-বিকচন, তাকে কবিতা ব'লে অভিহিত করতে কারো-কারো, বিবেকে না হ'লেও, সংস্কারে হয় তো বাধবে, সেই কাব্যকে কি তা হ'লে অন্ত-কোনো নামে অভিহিত করতে হবে? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেননি, কিন্তু আমাদের মনে যথার্থই কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। আর-একবার কান পাতুন, কবিতাটির নাম 'আমেরিকা', ষোলোটি আটপৌরে গদ্যের চরণ, কিন্তু এই শাদামাটা গদ্যই দুর্দাম গীতিকবিতা হয়ে ওঠে:

একটা পিয়ানো ছুটে চলেছে
মাত্রাছাড়ানো বেগে
রাতের বিতান ধ'রে

সোজা গিয়ে ধাক্কা খায়
আইল্যাণ্ড পার্কের কাচের সিন্দুকে
ভেঙে চুরমার
আর মাইফলকগুলোর গায়ে জাপটে থাকে
স্বর কোমল-ঋষভ
কোমল-ধৈবত
কোমল-গান্ধার।

কালো মেয়েটির
সিন্ধুআনন
নুয়ে পড়ে আমাদের ওপর,

পিয়ানোর রক্ত ঝ'রে চলে ক্ষীণ,-এক
অস্ফুট সুরেলা ধ্বনিতে—
আমেরিকা
কিন্তু তুমি তা প্রমাণ করতে পারবে তো? (পৃ. ১১)

কবিতা প্রমাণ করা করা যায় না, কবিতা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়, যে-বিশ্বাসের কন্দরে বোধ ও আবেগ পরস্পরকে প্রজ্ঞাপ্লাবিত করে। জনৈক বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক, হোলুব, স্বীয় বৃত্তিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁকেও কেন কবিতায় প্রবেশ করতে হয়, এই আপাতধাঁধারও সমাধান এই ঋজু সত্যের শরীরে: কবিতা সত্য, কবিতা শিব, কবিতা ওংকার, কবিতা না-লিখে বাঁচা যায় না, কবিতা সামাজিক প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে কলাসৃষ্টি সম্বন্ধে যাঁরা নানা ধরনের বক্রোক্তি ক'রে থাকেন, ক'রে থাকেন নিতান্তই অন্বীক্ষারহিত ধ্যানধারণার উপর নির্ভর ক'রে, হোলুবের কবিতা তাঁদের মস্ত ধাক্কা দেবে: আমাদের কুসংস্কারগুলিকে আমরা বড়ো বেশি ভালোবাসি, সেগুলি কেউ ভাঙতে এলে সেই পরিত্রাতাকেই কুৎসিত ভাষায় গাল পাড়ি আমরা, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে উত্তীর্ণ হতে আদৌ আমাদের আগ্রহ নেই। সমস্যাটি সত্তার স্বাধীনতা নিয়েই, কেউ-কেউ সত্তাকে স্বাধীনতামণ্ডিত করতে ভয় পান, হয় তো তাঁরা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি থেকেও ভয় পাবেন, কিন্তু তাঁদের ভয়ভীতি সত্ত্বেও এরকম প্রগাঢ়-নিখাদ কবিতা, এতটুকু অবয়বের মধ্যে, তথাকথিত 'স্বাধীন পৃথিবী'র দেশগুলিতে গত চল্লিশ বছরে ক'টি লেখা হয়েছে?

একটা গাছ ঢুকে পড়ে আর নুয়ে অভিবাদন ক'রে বলে:
আমি গাছ।
আকাশ থেকে ঝরে পড়ে কালো অশ্রুর ফোঁটা আর
বলে:
আমি পাখি।

মাকড়শার জাল থেকে নামে
প্রেমের মতো কিছু-একটা

কাছে আসে
আর বলে :
আমি স্তব্ধতা।
কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে ঘাড় ঝাঁকায়
ওয়েস্টকোট গায়ে
এক জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক
ঘোড়া, আর
বারে-বারে বলে,
সবদিকে তার কান খাড়া ক'রে
বলে আর বলে :
আমি ইতিহাসের ইনজিন
আর
আমরা সবাই
ভালোবাসি
প্রগতি
আর
সাহস
আর যোদ্ধার রোষ।

ক্লাসঘরের ভেজানো দরজার তলা দিয়ে
গড়িয়ে যায়
রক্তের এক সরু রেখা।

কারণ এখানেই শুরু
অপাপবিদ্ধের
নির্বিচার হত্যা। ('পাঠ', পৃ. ২৫-২৬)

ভাষার বাইরেও বিভঙ্গের প্রসঙ্গটি থেকে যায়। হোলুবের বেশির ভাগ কবিতায় ভাষাসারল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি শ্লেষাত্মক, ব্যঙ্গ-অধ্যুষিত ঝোঁক। হয় তো মধ্য ইওরোপের ঐতিহ্যের তাগিদ এটা, হয় তো স্পষ্টতা, জ্যাবদ্ধ ধনুর মতো,

যে-কোনো বক্রবলয়ে সবচেয়ে বেশি আত্মস্থ। কিংবা এমনও হ'তে পারে, যে-ইঙ্গিত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই দিয়েছেন, যেহেতু হোলুব বৃত্তিতে বৈজ্ঞানিক, সত্য তাঁর কাছে এত সাহজকিতায় প্রতিভাত যে ঘরোয়া রঙ্গের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটাতে তিনি উৎসাহী। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ থেকে মনে হয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হোলুবের পরিহাসবিজল্পনা কেতাবি ভাষার মধ্যবর্তিতায় সত্যকে নিংড়ে বের করতে উদ্‌গ্রীব, কেতাবি ভাষার অকারণ ভড়ঙের ভাঁড়ামিতে নিহিত সত্য যেন নিরাবরণ হয়ে বেরিয়ে এলো, যেমন :

ইহা একটি বালক।
ইহা একটি বালিকা।

বালকটির একটি কুকুর আছে।
বালিকাটির একটি বিড়াল আছে।

কুকুরটির গায়ের রঙ কী ?
বিড়ালটির গায়ের রঙ কী ?

বালক-বালিকা
একটি বল লইয়া খেলা করিতেছে।

বলটি কোন্‌খানে গড়াইয়া যাইতেছে ?
বালকটিকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইল ?
বালিকাটিকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইল ?

পড়ো
আর অনুবাদ করো
সব স্তব্ধতায় আর সব ভাষায় !

লেখো

তোমরা নিজেরা কোথায়
সমাধিস্থ আছো। ('এক মৃত ভাষার পাঠ্যপুস্তক', পৃ. ২৪-৫)

আমাকে লোভ সংবরণ করতে হচ্ছে, পংক্তির-পর-পংক্তি ভরিয়ে দেওয়া যায় হোলুবের এই কবিতাগুচ্ছ থেকে স্তবকের-পর-স্তবক উদ্ধৃত ক'রে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মূল চেক থেকে অনুবাদ করেছেন কি না আমার জানা নেই, অনুবাদে কতটা ভাবস্বাধীনতা নেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন তা-ও আমার জানা নেই, কিন্তু তাঁকে ফের একবার সাধুবাদ জানিয়ে এই আলোচনার ইতি টানবো, কারণ শেষ পর্যন্ত সব কথার সারাৎসার এটাই যে কবিতার ইতিহাসধারা তথা পরিবেশভূষার যুগ্ম উপস্থিতির স্বাক্ষর অনূদিত এই কবিতা-গুলি। আমাকে অন্তত আচ্ছন্ন ক'রে থাকবে হোলুবের পরিস্বচ্ছ মন্ত্রোচ্চারণ :

…তবু কবিতাই একমাত্র তলোয়ার ও ঢাল ;
কারণ কবিতা আসলে স্বৈরাচারী, স্বতশ্চল শকট, উন্মত্ততা, কর্কটরোগ বা মৃত্যু-তোরণের প্রতিপক্ষ নয়—বরং কবিতার লড়াই তারই সঙ্গে যা সবসময়েই ছিল—ভিতরে-বাইরে সবসময়. সামনে-পিছনে সবসময়, মাঝখানটিতে সবসময়—সবসময় যা আছে আমাদের সঙ্গে আর আমাদের বিরুদ্ধে !
কবিতা শূন্যতার বিরোধী, শূন্যতার মধ্যে কবিতাই অস্তিত্ব। তার যুদ্ধ সহজাত ও হাতফেরতা শূন্যতার বিরুদ্ধে—প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শূন্যতার বিরুদ্ধে। (পৃ. ৬৭)

অচেনাকে চিনে-চিনে

এটা গত পনেরো-কুড়ি বছরে ঘটেছে। বাসে, ট্রামে কিংবা গাড়িতে যাচ্ছেন, অথবা পায়ে হেঁটে, সিনেমা ঘরের বাইরে, দুপুর-বিকেল যে-কোনো সময়েই লম্বা লাইন। সবাই হিন্দি ছবির জন্য উতলা। কলকাতা শহরে বাংলা ছবি দেখতে পাওয়া এখন দুষ্কর। বাংলা চলচ্চিত্র তৈরিও তাই উপস্থিত প্রায় শূন্যের কোঠায় : সত্তর শতকের গোড়ায় হয় তো বছরে পঁয়তিরিশ-চল্লিশটি বাংলা ছবি বাজারে ছাড়া হতো, এখন তা সাকুল্যে দশ কি পনেরোতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাকে দোষ দেবো, কাকে গাল পাড়বো ? আশ্চর্য এক হেঁয়ালি, এক দিকে বাংলা ছবি আন্তর্জাতিক অথবা জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছে, তারই পাশাপাশি, বাংলা ছবির আদৌ বাজার নেই, এমনকি শিল্পগুণে যে-ছবি বহু পুরস্কার-শোভিত, তা পর্যন্ত মুক্তি পাচ্ছে না, সিনেমামালিকরা ফিরে পর্যন্ত তাকাচ্ছেন না। তাঁরাই বা কী করবেন, লোকেরা নিচ্ছে না যে-ছবি, তা নিয়ে তাঁরা দু' একবার সত্যিই পরীক্ষা করেছেন, এবং জব্দ হয়েছেন, সুতরাং আর কেন ? এমন নয় যে সব ছবিই উৎকর্ষের উচ্চ শিখরে বিরাজ করছে। এটা ঠিক, বাংলা চলচ্চিত্র তৈরির জন্য তেমন টাকা ঢালা হয় না, এক-দুই-তিন লাখ টাকার অঙ্কের মধ্যে প্রকরণগত উৎকর্ষ দেখানো মুস্কিল, রঙের জৌলুসও পরিহার করে চলতে হয়, কিন্তু ছবির দৈন্যদশার তা-ই প্রধান কারণ নয়। বেশির ভাগ বাংলা ছবি, স্বীকার করা ভালো, মার খাচ্ছে কারণ তারা মার খাওয়ারই যোগ্য, মেকি নাকি কান্না আর সস্তা হাস্যরস ছাড়িয়ে তারা এগোতে পারছে না। আর স্থূলত্বই যদি মুখ্য আকর হয়, তা হ'লে হিন্দি ছবির দিকেই দর্শকরা ঝুঁকবে, বাঙালি দর্শকরাও, ভাঁড়ামি-কাঁচা রসিকতা-অদ্ভুতকিম্ভুত প্রসঙ্গ অনেক বেশি চমক-গমক-প্রাকরণিক নৈপুণ্যের সঙ্গে সেখানে পরিবেষিত হচ্ছে।

তবে এখানে কার্যকারণ সম্পর্ক সম্ভবত উভপাক্ষিক। বাংলা ছবির মান

নিম্নগামী, অতএব বাঙালি রুচি অন্যত্র যাত্রা করেছে ; অন্য পক্ষে, যেহেতু বাঙালি রুচি পাল্টেছে, বাংলা ছবিও তাই আর কল্কে পাচ্ছে না। মেনে নেওয়া ভালো, সত্যজিৎ রায়-মৃণাল সেনের ভোক্তা দর্শক, এমনকি বাঙালি সমাজেও, প্রায় হাতে গোনা যায়, অন্য পরিচালকদের কথা ছেড়েই দিলাম।

এই রুচির রূপান্তর নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, অনেক কথা চিন্তনীয়। চিন্তনীয় রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে, সমাজতাত্ত্বিক-অর্থনীতিবিদদের পক্ষেও। রুচির রূপান্তর তো শুধু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান নয়। বামপন্থী যে-উজ্জ্বল আন্দোলন উত্তরস্বাধীনতা পর্বে তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর নিরবচ্ছিন্ন বাঙালি সমাজের ঐতিহ্য ছিল, তা কেন হঠাৎ স্তম্ভিত, কেন শিক্ষিত-সুমার্জিত-আত্মত্যাগী বামপন্থী প্রার্থীকে বিভিন্ন নির্বাচনে অতি অবলীলার সঙ্গে মাস্তান-গুণ্ডাদের প্রতিনিধি কলকাতায় তথা পশ্চিম বাংলার বহু মফস্বল শহরে হঠাৎ পরাজিত করতে পারছে, তার সামাজিক কারণগুলির বিশ্লেষণও অতি প্রয়োজন। এত পথ হেঁটে এসে বাঙালিরা কি ক্লান্ত, বাঙালিরা কি আত্মবিশ্বাসবিচ্যুত, বাঙালিরা কি আর পারছে না, তারা এখন তাৎক্ষণিকতার মোহে তাই কি নিজেদের সমর্পণ করছে, তারা কি এই প্রজ্ঞায় উপনীত হয়েছে যে সত্য ও মিথ্যের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, ন্যায় ও অন্যায়ের ভেদাভেদ নিয়ে ভাবা অর্থহীন কালস্খালন, যূথবদ্ধ অঙ্গীকারের কথা বাষ্পভারাতুর বাগ্‌বিস্তার, বাঙালিরা কি তা হ'লে নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডিতে গুটিয়ে নিয়েই পরিত্রাণ চাইছে ?

রুচির রূপান্তর সমাজচেতনার ঋতুপরিবর্তনের প্রতিভাস মাত্র। যা ঘটছে তা সমাজের প্রতিটি কোণাঘুপচিকে জড়িয়েই ঘটছে। বাংলা চলচ্চিত্রের অপযাত্রা বা অধোযাত্রা তাই কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যা ঘটছে বাংলা গানের ক্ষেত্রেও কি ঠিক তাই নয় ? হালের বাঙালি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ক'জন ধৈর্য ধ'রে, তৃপ্তির সঙ্গে, আনন্দে চকিত হয়ে উঠে, রবীন মজুমদারের আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে গাওয়া গান—'আমার অনেক দিনের আশা আমি বলবো কানে-কানে' অথবা 'আমার স্বপ্ন হলো স্বয়ংবরা'—উপভোগ করবেন ? অথবা কানন দেবীর গানের অধরা মাধুর্য তাঁদের হৃদয়ের কন্দরে অনুপ্রবেশ করবে—'যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে এঁকে থাকো কারো ছবি সে-কথা বলিয়া যেয়ো, ভুলিয়া যাবে কি সবই ?' কিংবা 'লাগুক দোলা লাগুক দোলা তোমার মনে,' নয় তো 'যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন, শুধু দূরে যেতে কেন বলো অমন…' ?

আমি ইচ্ছে ক'রেই গোড়াতেই বাংলা ছবির গানের প্রসঙ্গ তুলছি। ক'জন আর বর্তমান মুহূর্তে এই গবেষণাভিত্তিক তথ্যে আগ্রহবান হবেন যে উপরে যে-ক'টি গানের উল্লেখ করা হলো, তাদের গীতিকারদের মধ্যে আবিষ্কার করা যাবে সজনীকান্ত দাসকে, অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে? ক'জন এটা মনে ক'রে বিস্ময়ে আবিষ্ট হবেন যে এমনকি পাহাড়ি সান্যাল পর্যন্ত সুললিত রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন, কিংবা এটা মেনে নেবেন যে শচীন দেববর্মনের একমাত্র পরিচয় বিখ্যাত আর. ডি. বর্মনের প্রয়াত পিতা হিশেবে নয়, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে শচীন দেববর্মন বাংলা সংগীতের পরিবহে জাদু সংযোজন করেছিলেন, এবং সে-জাদুর স্পর্শে গোটা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ অভিভূত-উদ্ভাসিত হয়েছিল বছরের-পর-বছর ধ'রে?

শচীন দেববর্মনের পাশাপাশি অন্য-কয়েকটি নামও উল্লেখ করা কর্তব্য: হিমাংশুকুমার দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাসগুপ্ত, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনুপম ঘটক, আরো-দুয়েকজন যাঁদেরও কথা বলা আমার উচিত, স্মৃতিদৌর্বল্যের জন্য পারছি না। বাংলা গানে প্লাবন এসেছিল সে-সময়। ঠিক রবীন্দ্রনাথের গানকে এড়িয়ে নয়, রবীন্দ্রনাথের গানের পরিপূরক হিশেবেই যেন, যাঁরা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন, তাঁরা প্রায় সবাই হয় গান লিখছেন, নয় সুর দিচ্ছেন, নয় তো নিজেরাই গাইছেন। এই প্রবলোচ্ছ্বাস, মানতেই হয়, শুরু হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের ('কাজী নজরুল ইসলাম বাসায় একদিন গিছলাম ভায়া লাফ দেয় তিন হাত হেসে গান গায় দিনরাত প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয় ধরায় পর তার কেউ নয়,' সেই কাজী নজরুল ইসলাম) বেপরোয়া উন্মত্ততা থেকে—যে কবি সে গান বাঁধবেই, সেই গান উচ্চনিনাদে স্বয়ং গেয়ে পাড়াকে হতচকিত করবেই, এটাই তো বাঙালি ঐতিহ্য—; নজরুলপ্রভাব, বিশের-তিরিশের দশকে একটা সময়ে অন্তত, বাঙালি সমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অতিক্রম করার উপক্রম করেছিল। দুর্দমনীয় পরীক্ষার ঋতু গেছে সেটা বাংলা গানের ক্ষেত্রে। নজরুল নিজে গজল-কাওয়ালী থেকে শুরু ক'রে কীর্তন-শ্যামাসংগীত-ঝুমুর-ভাটিয়ালি এমন-কোনো প্রান্তর নেই চ'ষে বেড়াননি, কখনো-কখনো রাগাশ্রয়ী সংগীত নিয়ে পর্যন্ত পরীক্ষা করেছেন, তাঁর প্রত্যেকটি অভিক্ষেপ আশেপাশে অন্যান্যদের প্রেরণা জুগিয়েছে। পরীক্ষা মানে সাহসের পদযাত্রা, মেলাও মেশাও, এই রাগের সঙ্গে ঐ দেশজ সুর জুড়ে দাও, ধ্রুপদ আর ভাটিয়ালকে, ভয় কী, তালগোল করো না কেন, তোমার

নিজের উপরে যদি আস্থা থাকে, এবং তোমার অনুশীলনে যদি নিখাদ আন্তরিকতা থাকে, তুমি অবশ্যই এক বিদ্যুচ্চমক সৃষ্টি করতে পারবে, যা রসভোক্তা বাঙালিকে পাগল ক'রে ছাড়বে।

নিশ্চয়ই কাজী নজরুল ইসলাম পথিকৃৎ, কিন্তু সেই সঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া মহাপাতক হবে। যেহেতু বেশির ভাগ সময় তিনি তখন পণ্ডিচেরীতে কাটাতেন, হাজির হতেন মাঝে-মাঝে উটকো দামাল হাওয়ার মতো, বাংলা গানের উপর তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুলের মতো সর্বব্যাপী নয়; কিন্তু এক দিকে রবীন্দ্রনাথকে, অন্য দিকে তাঁর নিজের পিতাকে, পেরিয়ে আরো বহু দূর এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধির ফলাফল নিয়ে দুর্ভাগ্যবশত কোনো তন্নিষ্ঠ আলোচনাই আজ পর্যন্ত বাঙালি সমাজে হয়নি। দিলীপকুমার রায় তাই 'বৈষ্ণব জনতা', 'বৃন্দাবনে লীলা অভিরাম' কিংবা 'আমায় চাকর রাখো জী'-খ্যাত গায়ক হিশেবেই, আমার আশঙ্কা, পাদটীকালগ্ন হয়ে থাকবেন, তাঁর সামগ্রিক প্রতিভার পূর্ণাবয়ব বিশ্লেষণ শিকেয় তোলা থাকবে। অথচ ইওরোপীয় সংগীতের সারাৎসারকে আমাদের গানের অন্তরে সংশ্লেষণ ক'রে নেওয়ার যে-প্রয়াস তিনি বছরের-পর-বছর ধ'রে ক'রে গেছেন তা ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড়ো কৃতঘ্নতা কিছু হ'তে পারে না। এখনো কোনো অবসর মুহূর্তে উমা বসুর রেকর্ড পেড়ে ধুলো ঝেড়ে যদি 'নিঝর-ধারা শিহরধারা' অথবা 'রূপে বর্ণে গন্ধে আলোকে আনন্দে' শোনা যায়. এক সঙ্গে সহস্র জলকণার কলকাকলি ব'লে মনে হবে, অথবা যেন সহস্র অগ্নির চূর্ণ-চূর্ণ পিণ্ড তাঁর সেই কণ্ঠলাবণ্য থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে।

হিমাংশুকুমার দত্তের সুরবিস্তারে অন্তত, দিলীপকুমার রায়-প্রদর্শিত ছায়া-পথের আভাস। এই সমস্ত কিছু নিয়েই, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, বাংলা গানের উজ্জ্বলন্ত প্রহর কেটেছে। সেই গানে সাহিত্যের নির্যাস, ঐতিহ্যের ধ্রুপদবন্ধন, অথচ সেই সঙ্গে পরীক্ষার অদম্য সাহস, সব-কিছুর সঙ্গেই সব-কিছু মেলানো যায় যেন। উদাহরণ হিশেবে শচীন দেববর্মন কর্তৃক গীত একটি-দুটি গানের আমি উল্লেখ করছি। 'ডাকলে কোকিল ভোর বিহানে মাঠের পানে যাই' অথবা 'চোখ গেল চোখ গেল', প্রথম শ্রুতিতে ধারণা হবে শাদামাটা বাংলা পল্লীগীতি; পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙবে, হঠাৎ কোনো শুদ্ধ রাগের আশ্রয়ে কয়েক সোপান উপরে উঠে গেলাম আমরা, প্রথাগত শচীন দেববর্মন নয়, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের পৃথিবীতে যেন উত্তীর্ণ আমরা, বাধ্য হয়েই আমাদের তখন

পুঁথিলব্ধ জ্ঞানে প্রত্যাবর্তন করতে হয় যে, সত্যিই তো, শচীন দেববর্মন ধ্রুপদী সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে তালিম নিয়েছিলেন, এবং কোনো তালিমই তো বিফল হয় না। কিংবা স্মরণে আনুন শচীন দেববর্মনের গাওয়া অন্য-একটি গান, 'আলো-ছায়া দোলা উতলা ফাগুনে বনবীণা বাজে' : কথা অজয় ভট্টাচার্য, সুর হিমাংশু দত্ত, কণ্ঠ শচীন দেববর্মন। খাঁজে-খাঁজে যেন মিশে যাওয়া, মিলে যাওয়া : আমরা এক সঙ্গে কাব্য উপভোগ করছি, সংগীতের গভীরে পৌঁছে যাচ্ছি, বাইরের স্তব্ধ পৃথিবীকে অন্য-এক চেহারায় দেখতে পাচ্ছি, ঐ গানের মধ্য দিয়ে আমরা সংস্কৃত হচ্ছি, বিকচিত হচ্ছি, প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হচ্ছি। আমরা স্মৃতির কেন্দ্র-কন্দরে একটি স্থিরচিত্র, অথচ তা ঠিক স্থিরও না যেন, চিত্রটি অসহ্য আকৃতিতে থরোথরো কাঁপছে, সতত আশঙ্কা যে-কোনো মুহূর্তে সংহত আবেগ অন্তর্বাস দীর্ণ ক'রে চৌচির বেরিয়ে পড়বে : বাংলা মফস্বল শহর, বসন্তরাত্রি, মন্থর হাওয়ায় কুসুমাঘ্রাণ, একাকী এক পথচারী, তার গলা তেমন পরিশীলিত নয়, কিন্তু ক্ষতি নেই তাতে, সে গাইছে তার নিজের মেজাজে, ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে, যেন কথাগুলিকে, সুরের হ্লাদিত প্রবাহকে, গলায় আদর ক'রে-ক'রে একাকী সেই পথচারী নির্জন রাস্তা এগোচ্ছে আর গাইছে, 'আলোছায়া দোলা আলোছায়া দোলা উতলা ফাগুনে উতলা ফাগুনে বনবীণা বনবীণা বাজে, পথচারী অলি চলে যেথা কলি জাগে মধুলাজে মৃদুফুলবাসে সমীরনিশাসে মৃদুফুলবাসে অজানা আবেশ যেন ভেসে আসে আলোছায়া দোলা পথচারী কলি আলোছায়া দোলা আলোছায়া দোলা', বসন্তকাল, আকাশে ফিকে জ্যোৎস্না, সেই পথচারী, খোঁজ নিয়ে দেখুন, দিনের বেলা সে রাজমিস্ত্রী, কিন্তু, বসন্তরজনী, তাঁর কণ্ঠে, বসন্তরজনীর এই মধ্যপ্রহরে, অন্য-এক পৃথিবীর কুহক, বাংলা গান, বাঙালির গান, আমাদের অলৌকিক স্বর্গে পৌঁছে দিতে পারে সেই প্রতিশ্রুতির কুহক।

ভিন্ন স্বাদের অন্য-একটি উদাহরণের লোভ সংবরণ করতে পারছি না। 'যোগাযোগ' চলচ্চিত্র থেকে একটি গানের একটু আগে উল্লেখ করেছি, কানন দেবী কর্তৃক গীত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা, সম্ভবত কমল দাশগুপ্তের সুর : 'যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন, শুধু দূরে যেতে কেন বলো অমন ; হৃদয়ে না মেলে ঠাঁই নয়নে মানা তো নাই যদি না দুয়ার খুলিতে চাও খুলে রেখো বাতায়ন…'। ঐ একই গানে, খানিক বাদে, 'মেঘেরা যা কিছু আঁকিয়া যাক জানি আকাশে কখনো লাগে না দাগ' এবং, আরো-একটু পরে, অন্তর্নিহিত

দ্বৈত কৌতুক নিয়ে, 'কুসুম না যদি পাই কাননে মানা তো নাই'। যেটা লক্ষ্য করবার মতো, বাংলা গানের ভাষা ইতিমধ্যেই কত সহজ হয়ে এসেছে। তার কারণও স্পষ্ট : বাংলা কবিতার ভাষাই ইতিমধ্যে অত্যন্ত সহজ হয়ে এসেছে। এই সহজ ক'রে আনার প্রবাহেও নজরুলের ভূমিকা স্বীকার করতে হয়। যেখানে অপেক্ষাকৃত স্থূল, অথবা চটুল, রসের প্রসঙ্গ, সেখানেও ইতিহাসধারা মেনেই যেমন এগোনো, অন্যান্য ক্ষেত্রেও, ঐতিহ্য তথা বিষয়গাম্ভীর্যের প্রতি সম্মান বজায় রেখে, ভাষা সাহজিকতার দিকে এগিয়েছে, সাধারণ মানুষের কথোপকথনের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আস্তে-আস্তে একটু-একটু ক'রে ; সেই নিয়ম মেনে নিয়ে, বাংলা গানও এগিয়েছে। 'তার নিধুবন উন্মন ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন বুকে পীন যৌবন উঠিছে ফুঁড়ি' মুখে কামকণ্টক ব্রণ মহুয়াকুঁড়ি' থেকে উত্তরণ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'শাঙনের গাঙে ভাঙন ধরেছে এমনি তোমার দেহ বুকেতে সোনার গাগরি ভরিয়া এনেছো কি অনুলেহ ময়ূরপক্ষী তনু ময়ূরের মতো পেখম মেলেছে দেখিয়া উতলা হনু'-তে। কিন্তু কবিতার ভাষা সেখানেও থেমে থাকেনি, আরো অনেক সাহসিকতায়, প্রাত্যহিকতায় এগিয়ে গেছে। সেই তিরিশের দশকেই, 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ শুরু হবার পর্বে, সমর সেনের ঝাঁঝালো-নিরেট গদ্যে যেমন এক দিকে উত্তরণ করেছে বাংলা কবিতা, অন্য দিকে এমনকি তথাখ্যাত আবেগের কবিতা পর্যন্ত অনেক ঘরোয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে যে-উদাহরণ মনে এলো, তা বিষ্ণু দে থেকে : 'কহিলে তুমি কহিলে তুমি কী যে আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা, দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে…'। কিন্তু আরো অজস্র দৃষ্টান্ত অতি অবলীলায় সঙ্গে তুলে ধরা যায়। পাশাপাশি বাংলা গানের ক্ষেত্রেও। যাকে আমরা এখন আধুনিক বাংলা গান ব'লে চিহ্নিত করি, যার শুরু আজ থেকে মোটামুটি পঞ্চাশ বছর আগে, তা রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের মান রেখেছিল, প্রায় প্রত্যেকটি গানকেই গীতিকবিতা ব'লে চেনা সম্ভব ছিল, কাব্যসম্পদে ভরপুর, উৎকর্ষের দিক থেকে কোনো ঘাটতি নেই। এবং সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সাহসের সঙ্গে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞার মস্ত সুসমন্বয় ঘটেছিল, যার প্রমাণ হিশেবে আমি একটু আগে যেমন 'আলোছায়া দোলা উতলা ফাগুনে'-র উল্লেখ করেছি, সেই সঙ্গে 'যোগাযোগ' ছায়াচিত্র থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত হাল্কা চালের 'যদি ভালো না লাগে তো দিও না মনে'র কথাও সমস্বরে বলেছি। কৃষ্ণচন্দ্র দে কর্তৃক গীত একটি গানে, সেই তিরিশের দশকের গোড়ায়, আশ্চর্য আধুনিকতাস্পর্শিত মিল— 'জাগরণের বাস্তবে মানুষের

কী কাজ তবে'—আমাকে যে-মুগ্ধতার ঘোরে নিক্ষেপ করেছিল, তাকেই বা কী ক'রে ভুলে থাকি ?

পরীক্ষার ঋতু গেছে সেটা, কিন্তু কণ্ডুয়নের নয়। যে-কোনো কারুকর্মে সৃষ্টিসাফল্যের জন্য প্রয়োজন দক্ষতার, কিন্তু সেই সঙ্গে সমান প্রয়োজন প্রতিভারও, রুচিবোধেরও, দৃষ্টিভঙ্গিরও। উৎসাহ, রুচিবোধ ও প্রতিভার সাযুজ্য ঘটেছিল সে-সময় বাংলা গানে, এমনকি ছায়াচিত্রের জন্য রচিত বাংলা গানে, সেই সাযুজ্যের হুবহু অনুরূপ স্বাক্ষর পড়েছিল বাংলা চলচ্চিত্রেও। পরাধীন দেশ, প্রযুক্তিহীন দেশ, কিন্তু কী সংগীতে, কী চলচ্চিত্রে প্রতিভার সঙ্গে উদ্যোগ, নৈপুণ্যের সঙ্গে আবেগ, রুচির সঙ্গে আদর্শঅবৈকল্যের রাজযোটক আবিষ্কার করেছিলাম আমরা। আমার এই উক্তি পশ্চাদ্‌উন্মুখতা নয়, শিল্পনৈপুণ্যের ক্ষেত্রে অজস্র বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো অবশ্যই ছিল সে-সময়, কিন্তু কালের পরিমাপে-পরিপ্রেক্ষিতে তো বিচার করতে হয় সব-কিছুই।

এমন হয় তো কেউ বলবেন, বিশ্বব্যাপী মন্দার দরুন, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের-পীড়নে-হতাশ্বাস আমাদের দেশে সেই মন্দার পরিমাণ উৎকীর্ণতর হবার দরুন, সংখ্যার হিশেবে প্রতিভাবান মধ্যবিত্ত বেকার যুবকের আনুপাতিক অভাব ছিল না তখন, বাংলা শিল্পসাহিত্যের সৌভাগ্য, উক্ত যুবকসম্প্রদায় তাঁদের সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ ঘটাবার সুযোগ পেয়েছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সংগীতের ক্ষেত্রে, নাটকচলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-তথা-স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে-পশ্চিম বঙ্গে পরিবহ-প্রসঙ্গ পুরোপুরি ভিন্ন, পুরোনো সুদিনের জন্য মড়াকান্না কেঁদে অতএব কী লাভ, একমাত্র বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া ?

নিখাদ ব্যাখ্যা কিন্তু এখানেও নেই। কর্মসংস্থানহীন যুবকরা কবিতা না লিখে, সংগীতে মনোনিবেশ না ক'রে নেতিবাচক হাজার ব্যভিচারে নিজেদের অপচয় করতে পারতেন বিশের-তিরিশের দশকে, করেননি ; এমনকি মণীশ ঘটক-দীনেশ দাশদের জড়িয়ে আমরা এখন যে-সমস্ত লোহমর্ষক ইতিকথা শুনি, তাঁদের সৃষ্টিপ্রতিভাকে তারিফ জানাবার উপলক্ষ হিশেবেই শুনি। আসল ব্যাপারটি অন্যত্র : তখন একমুখী এক সামাজিক আদর্শবোধ ছিল, নিজেদের নৈপুণ্যে প্রতিষ্ঠিত করবো, আমাদের কৃতিত্ব দেশকে গরীয়ান করবে সে-ধরনের এক সামাজিক গর্ববোধ, নিজেদের উৎকর্ষে পৌঁছে নিয়ে যাবো, আমরা আপাতত বেকার হ'তে পারি, আমাদের দেশকে ইংরেজরা নিগড়ে বেঁধে শোষণে-পীড়নে

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করার চেষ্টায় অহরহ নিয়োজিত থাকুক না কেন, আমরা প্রমাণ করবো এই পরিবেশের মধ্যেও নিজেদের বিকশিত-উন্মোচিত করবার মতো শক্তি-প্রতিভা-উদ্যম আমাদের আছে ; সুযোগ যেহেতু সীমিত, সুযোগের যথাযথ ব্যবহার করতেই হবে, আমরা উৎকর্ষে উদ্দীপ্ত হবো, হয়ে সমাজের কাছে, জাতির কাছে, দেশের কাছে আমাদের সৃষ্টির উদাহরণ উজাড় ক'রে ধরবো।

এরই মাত্র কয়েক বছর বাদে, সাম্যবাদী স্বপ্ন-আদর্শ মধ্যবিত্ত বাঙালি মনশ্চিন্তায় অনুপ্রবেশের ফলে, সামাজিক মূল্যবোধের মস্ত প্রকৃতি-পরিবর্তন ঘটলো, এবং, কোনো বিশেষ রসায়নহেতু, বাঙালি জীবনচর্চায় এই পরিবর্তনের বিদ্যুৎক্ষিপ্র প্রভাব ছড়ালো। আমাদের বিবেককে একটি আদর্শ তাড়া ক'রে ফিরছে, আমরা একটি আশ্চর্য-নিটোল স্বপ্ন ফিরি ক'রে ফিরছি, একটি সোনালি সমাজের স্বপ্ন, আমাদের ব্যক্তিগত উত্তরণ সেই সামাজিক উত্তরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে, আমাদের অতএব সফল হ'তেই হবে, সৃজনশীলতার শীর্ষে আমাদের পৌঁছুতেই হবে, প্রতিভার সঙ্গে আবেগকে, দক্ষতার সঙ্গে অধ্যবসায়কে মেলাতেই হবে, যে-কোনো ক্ষেত্রেই আমরা নিজেদের নিয়োগ করি না কেন, কাব্যক্ষেত্রে হোক, গানে হোক, নাটকে হোক, ছবি-আঁকায় হোক, চলচ্চিত্রে হোক, আমরা উৎকর্ষতায় নিজেদের পৌঁছে নিয়ে যাবো, নিজেদের সংস্কৃত থেকে সংস্কৃততর, শাণিত থেকে শাণিততর করবো ; আমরা পরীক্ষায় ভয় পাবো না, ধ্রুপদের সঙ্গে লোকায়তকে আমরা মেলাবো, অন্তরের সঙ্গে বাহিরকে আমরা মেলাবো, আমরা সতত জিজ্ঞাসু থাকবো, সজীব থাকবো, সচল থাকবো। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বাঙালি সমাজ হাজার সংকটে ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কিন্তু ঐ দুই দশকে গর্ব করবার মতোও বহু কিছু ঘটেছে এই সামাজিক শপথের নির্ভরে। শিল্পের বিভিন্ন দিকে, সাম্যবাদী প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, বাঙালি প্রতিভা সৃজনশীলতার অজস্র সাহসী তোরণ, একটির-পর-আর-একটি, রচনা করেছে। স্বাধীনতা-দেশভাগ থেকে বাঙালি সমাজ মস্ত ধাক্কা খেয়েছে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে বাঙালির আর্থিক-সামাজিক সংকট জটিলতর, গভীরতর হয়েছে, পুরোপুরি ভেঙে পড়ার মতো পরিপার্শ্ব, কিন্তু, যেহেতু বাম-পন্থী আদর্শ ইতিমধ্যে মধ্যবিত্ত-প্রায়-বিত্তহীন-হবার-উপক্রম বাঙালিকে নতুন আত্মস্থতা শিখিয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ভাষায়, বঞ্চনাদ্বীপ পার হয়ে যেখানে পৌঁছুনোর জন্য আকৃতি, সেই জনসমুদ্রের ঠিকানার হদিশ দিয়ে গেছে। আরো

যা মস্ত লাভ ঘটেছে, সাম্যবাদী আদর্শ আন্তর্জাতিক আদর্শ, সাম্যবাদী স্বপ্ন গোটা ভুবনজোড়া স্বপ্ন, বাঙালি অতএব তার সমস্যাকে সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যার সঙ্গে, এবং তা পেরিয়ে সারা পৃথিবীর খেটে-খাওয়া মানুষের সমস্যার অনুভূমিকায়, বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতাযুক্ত হয়েছে। সমস্যার পর সমস্যা বাঙালি সমাজকে ঘিরে দাঁড়ানো, আপাতত মনে হয় পরিত্রাণের পথ নেই, কিন্তু যেহেতু সাম্যবাদের তত্ত্ব আর তত্ত্বে স্থিত নেই, আমাদের জীবনে তা অনুপ্রবেশ ক'রে গেছে, আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে, বাঙালি, সেই চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে, নিজেকে এক নতুন প্রত্যয়ে অন্বীত করতে শিখলো, যার ফলশ্রুতি ফুটে বেরলো নাট্যআন্দোলনে, সংগীতেনৃত্যে, চিত্রচর্চায়, শিল্পকলার আরো নানা প্রশাখায়। আলাদা ক'রে উল্লেখের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না, কিন্তু বিজন ভট্টাচার্য-ঋত্বিক ঘটক-দেবব্রত বিশ্বাস-শম্ভু মিত্র-সুচিত্রা মিত্র-হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-উৎপল দত্ত-তাপস সেন-মৃণাল সেন-চিত্তপ্রসাদ-সূর্য রায়-সোমনাথ হোড়-তৃপ্তি মিত্র-অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-সলিল চৌধুরী-পরিবৃত যে-পৃথিবীখণ্ডের পরিচয় বাঙালি সমাজ হিশেবে—কবি কিংবা সাহিত্যিকদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি—সেখানে উৎকর্ষের সঙ্গে অভিনিবেশ পাশাপাশি ঘন-আবিষ্ট, যে-আবেশের প্রেরণা সাম্যবাদী আন্দোলনের যূথবদ্ধ ত্যাগদৃপ্ত আদর্শসত্তা। সম্মিলিত প্রেরণা, সম্মিলিত প্রতিভা, সম্মিলিত উৎসাহ, সম্মিলিত সৃষ্টিসাহস। উৎকর্ষ থেকে যেমন সাহস, সাহস থেকেও তেমনি উৎকর্ষ, কিন্তু সাহসকে উৎসাহ জুগিয়ে গেছে আন্দোলন, যে-আন্দোলনের ভিত্তিভূমি প্রোথিত সমাজদর্শন, ভবিষ্যৎবিশ্বাস।

এখন যে-কথাগুলি বলছি, সাবধানতার সঙ্গেই বলছি, কিন্তু না ব'লে উপায় নেই আমার। বিশ-তিরিশ দশকের ঐতিহ্যকে, উপেক্ষা ক'রে নয়, সেই ঐতিহ্যের পরম্পরাতেই চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের আদর্শসম্পৃক্ত অভিজ্ঞানযাত্রা। কিন্তু ষাটের দশকের উপান্তে পৌঁছে, এখন সন্দেহ না হয়েই পারে না, মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ যেন একটি বিশেষ অবস্থানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। পরীক্ষার ঋতু, সাহসের ঋতু, প্রত্যয়ের ঋতুর অবসান ঘটলো যেন। সেই তারিখ থেকে এখন পর্যন্ত, এই গত বছর কুড়ি ধ'রে, শিল্পসাধনার একটি মস্ত অঙ্গন জুড়ে, সমস্ত-কিছুই যেন চর্বিতচর্বণ, বাঙালি কুঁকড়ে এলো, লক্ষণগুলি মিলিয়ে পড়লে সন্দেহ হবে, বাঙালি রক্ষণশীলতাকে বরণ ক'রে নিলো। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বাঙালি চলৎশক্তির প্রধান উপাদান বামপন্থী আন্দোলনউদ্ভূত প্রেরণা; সেখানেও যেন

জড়তা, সামনের দিকে কী আছে তা আবিষ্কারে ঈষৎ অনীহা, যে-যেখানে-আছি-দাঁড়িয়ে-থাকি : কী-দরকার-নতুন-প্রান্তর-পরিসীমা-সীমাহীনতা-আবিষ্কারের গোছের হীনমন্যতা। অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে, অচেনাকে চিনে-চিনে উঠবে জীবন ভ'রে : বাঙালিদের সবচেয়ে বড়ো দিগ্‌নির্দেশক এই কথাগুলি লিখেছিলেন, বর্তমান অবস্থায় তা মেনে নেওয়াও যেন কঠিন হয়ে পড়ে।

রুচির-মানের যে-অধোগামিতা বাঙালি সমাজে সর্বত্র দৃশ্যমান, তার সূত্র, আমার বিবেচনায়, শিল্পকলার ক্ষেত্রে, বিগত দুই দশক ধ'রে, বামপন্থী আন্দোলনের এই পরীক্ষাপরাঙ্মুখতায়। আমার সীমিত বুদ্ধির গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে ভেবেচিন্তেই এই মন্তব্য করছি। সামগ্রিক আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে দেখলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী ইতিকথায়, সাম্যবাদী আন্দোলন বাদ দিয়ে অন্য-কোনো বিকল্প সাধনার ইঙ্গিত বাঙালি চিকীর্ষায় ধরা পড়েনি। সমাজের বিভিন্ন পরিষঙ্গে যা কিছু ঘটেছে, বিতর্ক তুলেছে, আলোড়নে জল ঘোলা করেছে, আবেশে মুগ্ধ করেছে, তা সমস্তই সাম্যবাদী কবিকর্মীশিল্পীদের সৃষ্টিকে কেন্দ্র ক'রে, নয় তো সাম্যবাদী আন্দোলনকে অতিক্রম ক'রে যাওয়ার প্রয়াসঘটিত, নয় তো সেই আন্দোলনকে আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করার আগ্রহ থেকে সঞ্জাত। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বসু, কমিউনিস্ট পার্টি, গত একশো বছরের বাঙালি সামাজিক ইতিহাস শেষ পর্যন্ত এই তিনটি সৌরমণ্ডলের উপর নির্ভর ক'রে : বাঙালি রাগঅভিমান, বাঙালি ক্রোধঅহমিকা, বাঙালি স্বপ্নদেখা-স্বপ্নভাঙা, উপলক্ষগুলি আলাদা-আলাদা, লক্ষ্যগুলির কিন্তু নিহিত উৎসমূল উক্ত ত্রয়বিন্দুর একটি কিংবা অন্য-আরেকটিতে স্থিত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে একান্তভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি-নির্ভর। এমনকি যাঁরা ইন্দিরা-গান্ধি-যুগ-যুগ জিও-তে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা বামপন্থী জুজুবুড়ির আতঙ্কের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যেই ঐ মন্ত্রোচ্চারণে নিমগ্ন হয়েছেন।

বাঙালির সমাজসংকট, তার সহস্র অভিরূপ, তথাকথিত বাংলা আধুনিক সংগীতের রচনায় নিরক্ষতার স্বাক্ষর, সুরপ্রয়োগে উৎকট নির্বুদ্ধির তথা রুচিশূন্যতার ছাপ, যিনি গাইছেন তাঁর কণ্ঠশক্তি রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত, বাঙালি চলচ্চিত্রের গড় মান, মনে হয়, উনবিংশ শতকীয় তুলাদণ্ডে অপসৃত, অধিকাংশ ছবি প্রায় পুরোটা সময় ভ'রে দেখার সত্যিই অনুপযুক্ত, না আছে রুচি, না আছে গমক, না আছে আদর্শনিষ্ঠা না আছে চমক ; বাঙালি কাব্য, আমি পশ্চিম বাংলার কবিতার কথাই বলছি, যেন পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে যা-যা শেষ লেখা হয়েছিল তাদের

উপর ফের দাগা বুলোনো হচ্ছে, বাংলা গল্প-উপন্যাস যেন বাসি খবরকাগজের নীরক্ত পৃষ্ঠা, যেখানে পরশ্রীকাতরতা আছে, সময়বোধ নেই। বাঙালি নাটকে, মৌলিক আবেগ তো বহুদিন বিসর্জিত, এখন অনূদিত উৎসাহও, মিইয়ে-মিইয়ে, আশঙ্কা হয়, সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, এমনকি উৎপল দত্তকেও মনে হয় যেন জীবনানন্দ-কথিত সেই সার্কাসের ব্যথিত সিংহ। বাঙালি সাংবাদিকতা নোংরা পাড়ার চুটকির নির্ঝর। বাঙালির সামগ্রিক মানসিকতায় ভয়ংকর এক প্রাদেশিকতার ছোপ। এই প্রাদেশিকতার অন্য রূপ অশ্লীলতা, যে-অশ্লীলতা শুধু মাস্তানের কুৎসিত খেউড়ে-ছুরিবোমার চাউড়ে প্রতিভাত নয়, তার প্রকাশ হাটে-বাজারে-ফুটবলের মাঠে, ব্যাংকে-ডাকঘরে-সরকারি দপ্তরে : আমরা কূপমণ্ডুক, আমরা কূপমণ্ডুকতার অন্তিম গহনে পৌঁছে গেছি, যেখানে আমরা একমাত্র নিজেদের নিয়েই নিযুক্ত হয়ে পড়েছি, আমরা জানতে চাই না, বুঝতে চাই না, আমাদের প্রতিবেশী বাঁচলো কি মরলো কি ধুঁকলো তাতে আমাদের আর কিছু যায় আসে না যেন।

পরীক্ষাবিমুখতা বলুন, রুচির নিম্নগামিতা বলুন, চর্বিতচর্বণ বলুন, এই মানসিকতার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। বাংলা চলচ্চিত্র-বাংলা গানের প্রসঙ্গ দিয়ে আমি আলোচনা শুরু করেছি, নিছক উদাহরণ হিশেবেই করেছি তা, সমস্যাটি কিন্তু জীবনযাত্রার সব-ক'টি শাখাপ্রশাখা জড়িয়ে। বাঙালি, পশ্চিম বাংলার বাঙালি, বাঙালি মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সমাজ, গত বছর কুড়ি ধ'রে ভয়ংকর সংকটাপন্ন। এবং, ইতিমধ্যেই যে-কথা বলেছি, এই সংকটের সঙ্গে আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলনের অন্তর্লীন সংকটের কার্যকারণসম্পর্ক উপেক্ষা করা অসম্ভব। বাঙালি সমাজ হঠাৎ যদি তার সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে গিয়ে থাকে, তার কারণ সাম্যবাদী আন্দোলনের, কোনো-কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে, গতি-গতিহীনতা-কুম্ভীপাকবৃত্তির গভীরে। অথচ বাইরের থেকে দেখলে মনে হবে, আমার উক্তির মূলে কোনো যুক্তি নেই, তথ্য নেই, গত কুড়ি বছরে পশ্চিম বাংলায় বামপন্থী ঝোঁক থমকে পড়েনি আদৌ, বরঞ্চ, গোটা ভারতবর্ষে, একমাত্র এখানেই তো, এবং সেই সঙ্গে ফের বাঙালি-অধ্যুষিত ত্রিপুরায়, সাম্যবাদী আন্দোলনের, কমিউনিস্ট পার্টির, বিজয়ের রথ প্রায় অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে গেছে। যা মনে হয় অনেক ক্ষেত্রেই তো তা নয়। সাম্যবাদীদের ব্যূহগঠনের ক্ষমতা সন্দেহ নেই বহুগুণ বেড়েছে, সন্দেহ নেই গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর-ভাগচাষী-আদিবাসীদের শ্রেণীচেতনা বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সন্দেহ নেই বিবেকবান আদর্শবাদী বহু সহস্র কর্মী প্রতিদিন এখনো সাম্যবাদী আন্দোলনের পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে নতুন ক'রে

শপথ গ্রহণ করছেন, সঙ্গে-সঙ্গে এটাও বলতে হয়, অসম্পূর্ণতা-বিভিন্ন ধরনের অযোগ্যতা-ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বামপন্থীদের নেতৃত্বে যে-রাজ্য সরকার আট বছর ধ'রে পশ্চিম বাংলায় সমারূঢ়, তা বাঙালি সমাজের নিপীড়িত, শোষিত অংশকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে, এবং সমাজশত্রুদের প্রতি ঘৃণাকে সংহত-সংগঠিত রূপ দিতে সফল হয়েছে। কিন্তু, পাশাপাশি, অন্য-কতগুলি লক্ষণও তো সমান প্রকট। বামপন্থী আন্দোলন তথা বামপন্থী রাজ্য সরকার সৃষ্টিশীল প্রতিভার তেমন-কোনো বড়ো পরিচয়, অন্তত নন্দনচর্চার ক্ষেত্রে, সত্যিই দিতে পারছে না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আন্দোলন যেন পা তুলছে-পা নামাচ্ছে-পা নাচাচ্ছে, পুরোনো-সনাতন-প্রতিষ্ঠিত বুলিগুলি প্রতিনিয়ত পুনরুচ্চারিত হচ্ছে, অভিজ্ঞতার আলোয় প্রকরণ-পরিভাষা পরিমার্জিত হচ্ছে না, পঞ্চাশের দশকে যে-কথাগুলি সুপ্রত্যয়ে উচ্চারিত হতো, এখনো সেগুলিই আওড়ানো হচ্ছে, যে-গানগুলি গাওয়া হতো, এখনো সেগুলিই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাওয়া হচ্ছে, অথবা গানের কথা ঈষৎ-একটু পাল্টে নেওয়া হয়েছে মাত্র সমকালীন কোনো ঘটনাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে, সুর-শৈলী-আঙ্গিক হুবহু একই থেকে গেছে কিন্তু। এই একই সমস্যা সমাজের সর্বক্ষেত্রে: সাম্যবাদী আন্দোলন শারীরিক অর্থে জোরদার হয়েছে, অথচ মানসিক প্রক্রিয়ায়, কখনো-কখনো সন্দেহ হয়, জড়ত্ব ছেয়ে এসেছে। সাম্যবাদী সংগঠন মানে প্রগতির সংগঠন, উদ্ভাবনের সংগঠন, পরীক্ষার-সৃষ্টিশীলতার সংগঠন, নিত্য-নতুন প্রশ্ন নিয়ে জটলা করা তার প্রধান উপজীব্য হওয়া উচিত। বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে—আমাদের সমাজে তার কী প্রতিফলন পড়ছে—নতুন কোন্-কোন্ লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—এই লক্ষণগুলির কোন্-কোন্‌টি আমাদের আদর্শ-লক্ষ্যের বিচারে শুভ, কোন্-কোন্‌টি অমঙ্গলের বার্তাসূচক—এই পরিস্থিতিতে আমাদের কী-কী করণীয়—দ্বান্দ্বিক ঘাত-প্রতিঘাত থেকে কী অভিজ্ঞানে আমরা পৌঁছুচ্ছি—সেই অভিজ্ঞান থেকে কোন্ নতুন সৃষ্টিকর্মে আমরা উপনীত হচ্ছি—কোন্ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমাদের যাওয়া অবিলম্বকর্তব্য: আমার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু মনে হয় না এ-ধরনের দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় আমাদের সাম্যবাদী আন্দোলন সম্প্রতি আদৌ জর্জরিত হচ্ছে। মার্ক্সীয় প্রজ্ঞা গতিশীলতার কথা বলে, জিজ্ঞাসায় নিজেকে দীর্ণ করবার কথা বলে, নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত থেকে নীতিকে কী ক'রে জীবনের ফসলে পরিণত করা যায় তা নিয়ে ব্যাপক-বিস্তৃত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে বলে, অথচ পশ্চিম বাংলার বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেন এ-সমস্ত মার্ক্সীয় অঙ্গীকারের

বাইরে, যেন সমুদ্রে ঝড় উঠছে না কোথাও, যেন সমুদ্রে ঝড় উঠলেও তা আমাদের স্পর্শ করছে না, আমরা আনন্দের নাতিদীঘল পুকুরে অলস বিলাসে জলকেলি ক'রে যেতে পারবো অনন্ত সময় ধ'রে, আমরা অসূর্যম্পশ্য, এবং সেটা আমাদের কাছে চিন্তার বিষয় নয়, উদ্বেগের কারণ নয়, আমরা আমাদের অজ্ঞতায় আত্মস্থ, সমাহিত।

বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ, বাঙালি সাংস্কৃতিক আন্দোলন চিন্তা থেকে, গত বছর কুড়ি ধ'রে, নিজেকে যেন সন্তর্পণে সরিয়ে নিয়ে এসেছে, পরীক্ষা থেকে, প্রতিভার প্রয়োগ থেকে। প্রযুক্ত না হ'লে প্রতিভার ধার কিন্তু ক'য়ে যায়। চারদিকে তাকিয়ে আশঙ্কা হয়, ঠিক সেই জিনিশই হচ্ছে। আমি এই প্রসঙ্গে যা বলতে চাইছি, তা নিয়ে ভুল-বোঝাবোঝির যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কাউকে আঘাত দেওয়ার, অথবা কারো কর্মপ্রয়াসকে হেয় করবার, উদ্দেশ্য আমার বিন্দুতম নেই। আমাদের সাম্যবাদী-প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হাজার-হাজার তদ্গতমন কর্মীশিল্পী আছেন, যাঁদের তিতিক্ষায় কোনো ফাঁক নেই, যাঁরা স্ব-স্ব বোধঅভিজ্ঞতাপ্রেরণার সংস্থানে দাঁড়িয়ে কর্তব্য সম্পন্ন ক'রে যাচ্ছেন তাঁরা আমাদের নমস্য, তাঁদের আদর্শগরিমা অথবা আত্মত্যাগকে খাটো ক'রে দেখবার চেষ্টার চেয়ে মহাপাতক কিছু হ'তে পারে না। আমার আবেদন কিন্তু তাঁদের কাছেই, আত্মজিজ্ঞাসায় দীর্ণ আমি, আমাদের সম্মিলিত স্বপ্নসাধনাকে সফল করবার দায়িত্ব তো আমাদের সকলের, এবং তার স্বার্থে যদি অকপট কিছু অকরুণ উক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেই দায়ভার এড়াবো কোন্ অধিকারে?

জীবনানন্দ দাশের স্বল্প পরিচিত এক পংক্তিতে একটি মস্ত দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত হয়ে আছে : ঘরের ভিতরে কেউ খোঁয়াড়ি ভাঙছে ব'লে কপাটের জঙ্ নিরস্ত হয় না তাঁর আপন ক্ষয়ের ব্যবসায়ে। পশ্চিম বাংলা ভারতবর্ষের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবয়ব থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না, সামন্তশক্তি-পুঁজিশক্তি পরস্পরকে ধারণ করছে ভারতবর্ষের মাটিতে, মধ্যযুগীয় অন্ধকারের সঙ্গে বিংশ শতকের সর্বশেষ অধ্যায়ের সুবিধাবাদী বোঝাপড়া, বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য জাদুগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে যাতে ভারতবর্ষের মানুষকে আরো বেশ-কিছু দশক মধ্যযুগীয় অন্ধকারের গহনে ডুবিয়ে রাখা যায়। এই অবস্থায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন অবমাননায়, অশালীনতায় লাঞ্ছিত। আমরা প্রহৃত হচ্ছি, অপমানিত হচ্ছি, আমাদের বুদ্ধিকে-যুক্তিক্ষমতাকে-বিবেককে 'অহরহ ব্যঙ্গ করা হচ্ছে : এসো, ভয় পাচ্ছো কেন, ক্ষমতা যদি থাকে লড়তে

নামো, তোমাদের—ভারতীয় প্রজাকুলকে—মধ্যযুগে আবদ্ধ ক'রে রাখবো, তোমাদের বর্বরতা থেকে গভীরতর বর্বরতায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবো, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদির প্রয়োগ ঘটিয়ে তোমাদের অশ্লীলতায় ডুবিয়ে রাখবো, তোমাদের চৈতন্যহীন করবো, দিনের পর দিন, তোমরা অপসংস্কৃত হবে; তোমরা সংঘবদ্ধ গণচেতনার কথা বলো, সাম্যবাদী আদর্শের অমোঘ বিজয়ের নির্ঘোষ উচ্চারণ করো, কিন্তু, এই ভারতবর্ষের মাটিতে, আমরা প্রগতিকে, ছাখো, কত সহজে রুখে দিচ্ছি, আমরা প্রমাণ করিয়ে দেখাচ্ছি সদসদে কোনো ভেদাভেদ নেই, মাস্তানদের সামাজিক অধিষ্ঠান বিবেকবান পণ্ডিত-অধ্যাপকদের অনেক উপরে, আমরা এই নতুন দর্শনে ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করছি যে অধর্মই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম; তোমাদের যদি সাহস থাকে, ক্ষমতা থাকে, আত্মবিশ্বাস থাকে, এসো, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, আমাদের অশ্লীলতাকে তোমাদের আত্মত্যাগের পরাক্রম দিয়ে, ইতিহাসবোধের অহমিকা দিয়ে, পরাভূত করার চেষ্টা করো, যদি পারো, যদি তোমাদের ক্ষমতায় কুলোয়, আমাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হও।

মুখোমুখি সংকট, সমাগত সংকট, কিন্তু, এই পরিপ্রেক্ষিতে, কী চিন্তার ক্ষেত্রে, কী প্রকরণের প্রয়োগে সাম্যবাদী আন্দোলন বিস্ময়দ্যোতক কোনো প্রতিজ্ঞার বা প্রতিভার স্বাক্ষর হালে রাখতে পেরেছে কি? অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, প্রশ্নের উত্তর প্রধানত নেতিবাচক। লোকায়ত অভিধানে, সংস্কৃতির অঙ্গনে, সাম্যবাদী আন্দোলনের পক্ষ থেকে হ্রেষাধ্বনি সোচ্চার হয়েছে: জোট বাঁধো, অঙ্গীকারবদ্ধ হও, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সামিল হও। যে-সংস্কৃতি, বা সংস্কৃতির নামে যে-ব্যভিচার, আমাদের বহুর প্রত্যয় থেকে একের সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, যা আমাদের সামগ্রিক সমাজচিন্তা থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াসী, যা অসার শূন্যতাবাদের বাণী প্রচার করে, তার বিরুদ্ধে জনতার সংঘবদ্ধ সংগ্রাম, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কিন্তু আমাদের তো এই দৃঢ়বদ্ধ শপথ-প্রতিজ্ঞার কথা তুলনায়-প্রতিতুলনায় উপস্থান করতে হবে, অপসংস্কৃতির বৈপরীত্যে সুস্থ, সুষম, সৌরভউদ্ভাসিত সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মকে তুলে ধরতে হবে। অস্বীকার করতে গেলে অনৃতভাষণের অভিযোগযুক্ত হ'তে হবে, নামতা পড়ার মতো ক'রে সাম্যবাদী আন্দোলন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ওষ্ঠগত বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, কিন্তু এই যুদ্ধে গভীর কোনো চিন্তা প্রভাব ফেলেছে ব'লে মনে হয় না, কৌশলগত দক্ষতাও প্রায় অনুপস্থিত।

গত কয়েক দশকে পৃথিবী এগিয়ে গেছে, ভারতবর্ষ রূপান্তরিত হয়েছে,

পশ্চিম বাংলার সামাজিক অবয়বেও অনেক ক্লান্তির-ঝঙ্কার-আবর্তনের ছায়া পড়েছে। সুতরাং তিরিশ-চল্লিশ দশক আগে যে-কথাগুলি যে-বিভঙ্গে উচ্চারণ করলে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষকে কাছে টেনে আনা যেত, এখন সেগুলি অনুপযুক্ত, অপাংক্তেয়। তার কারণ নিছক এই নয় যে পুরোনো কাসুন্দির এমনিতেই ঝাঁঝ কম ; তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে যা ছিল উজ্জ্বল-অভিনব সৃষ্টির জাদুমণ্ডিত, এখন অনেক ক্ষেত্রে, নিরেট অনুকারকদের হাতে প'ড়ে, তা-ই ক্লান্তিকর সানুনাসিকতায় পর্যবসিত : নিষ্প্রাণ গতানুগতিকতা আছে, কিন্তু যুক্তির দীপ্তি নেই ; সাম্যবাদী আন্দোলন-লগ্ন শিল্পসংস্কৃতিপ্রয়াস, যা কিনা প্রগতিশীলতার তীক্ষ্ণতম উন্মোচন হওয়া উচিত, তা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পা তুলছে-নামাচ্ছে-নির্জীব নাচাচ্ছে, সাম্যবাদী আন্দোলন, মাঝে-মাঝে ভয় হয়, হয় তো বা অতীতের মায়াবিলাসে মুহ্যমান।

নিহিত সমস্যার সূত্রগুলি, স্বগত উচ্চারণে, আমরা ইতিমধ্যেই সম্ভবত পরস্পরকে জানাতে শুরু করেছি। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন গত কুড়ি বছরে বহুবিভক্ত হয়েছে, প্রগতিশীল কবিকর্মীকলাকুশলীদের সৃষ্টিকার্যে তজ্জনিত অনুৎসাহ তো লুকোবার ব্যাপার নয়, সাম্যবাদী আন্দোলন, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ, বিবাদের আরক্ততাচ্ছন্ন, আমরা জানি ইতিহাস এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা জানি সমাজবিপ্লব ঘটবেই, কোনো প্রতিক্রিয়াশীলেরই সাধ্য নেই প্রগতির জয়যাত্রাকে প্রতিহত করার, কিন্তু যা আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে অভাবনীয় ছিল, সাম্যবাদী কর্মীরা তথাচ আত্মজিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত, যার ছায়া পড়েছে কর্মের-সৃষ্টির ক্ষেত্রে। মৌলপ্রধান জাতীয় সমস্যাদির উৎস-সন্ধানেও প্রায় অনুরূপ সংশয়ের উদয় হয়েছে : সাম্যবাদীদের মধ্যেই কেউ বলছেন এই ব্যাখ্যা ঠিক, অন্য-কেউ বলছেন, উঁহুঁ, এটা নয়, ওটা। এই ইতিবৃত্ত আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু এই ইতিবৃত্তের ধকল সইতে হচ্ছে, আমার সন্দেহ, শিল্পের-সৃষ্টির-কর্মের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে। যে-দ্বান্দ্বিকতা এড়িয়ে প্রগতির আন্দোলন এগোতে পারে না, তার শিকার হয়েছেন, হচ্ছেন সাম্যবাদীরা নিজেরা, যে-শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অথচ দ্বান্দ্বিক অস্ত্র প্রয়োগ মহত্তম কর্তব্য, সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে। চিন্তা, চিন্তার প্রয়োগ, সৃজনপ্রতিভা, সেই প্রতিভার প্রয়োগ, প্রয়োগের প্রক্রিয়া থেকে যে-অভিজ্ঞতালাভ তা থেকে জিজ্ঞাসার উন্মেষ, সেই জিজ্ঞাসা থেকে ফের দ্বান্দ্বিকতায় প্রত্যাবর্তন, যে-দ্বান্দ্বিকতা বাদ দিয়ে সাম্যবাদী সৃষ্টির পক্ষে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হওয়া

অসম্ভব, তা হ'লে কি এই ইতিহাসগ্রাহ্য প্রবাহ সম্বন্ধেই আমাদের আন্দোলনে ভয় ঢুকে গেছে? তা হ'লে কি চিন্তার প্রয়োজন নেই, প্রতিভাকে পাখা মেলতে দেওয়ার প্রসঙ্গ অবান্তর? এমন দ্বিধাজড়িমাই কি জয়যুক্ত হচ্ছে, ও-সব প্রশ্ন তুললেই আমাদের ব্যূহৎশক্তিতে হয় তো চিড় ধরবে, সুতরাং নিজেদের অনুশাসনে বেঁধে রাখো, চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করো, প্রতিভার গন্‌গনে উত্তাপে জল ঢালো, এসো, আমরা রক্ষণশীলতায় স্থিত হই? আমরা কি তা হ'লে এই ভীতগ্রস্ততার অন্ধগলিতে, দিশেহারা, পরস্পরকে শুধু বাম্পবহুল আশ্বাসবাণী শোনাবো?

আমাদের পরিবেশ পাল্টে যাচ্ছে, আমাদের শত্রুরা নিত্য-নতুন প্রকরণে নিজেদের প্রসাধিত করছে, অথচ আমরা নিজেরা তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের চিন্তায়-প্রকরণে নিজেদের আটকে রেখেছি, প্রতিভাকে যেহেতু ব্যবহৃত হ'তে দিচ্ছি না, প্রতিভার শরীরে মরচে পড়ছে, প্রতিভা উত্তম থেকে অধমের দিকে গড়াচ্ছে, সাম্যবাদী আন্দোলনের ছত্রছায়ায় তিন-চার দশক আগেও সবচেয়ে সৃষ্টিশীল প্রতিভাবানরা সমবেত হতেন, এখন, স্বাভাবিক কারণেই, সেখানে নিষ্প্রভ থেকে নিষ্প্রভতরদের ভিড়। কেউ-কেউ হয়তো প্রতিবাদ ক'রে বলবেন, আমার বক্তব্য একপেশে, আন্দোলন যেহেতু জনতার সমীপবর্তী হচ্ছে, অতএব সৃজনশীল কর্মীদের সমাবেশেও গুণগত পরিবর্তন ঘটছে, যাঁরা এখন ভিড় করছেন, মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে তাঁদের নাম না থাকতে পারে, কিন্তু জনতার মুখরিত ঐক্যে তাঁরা সবচেয়ে সোচ্চার। এটা অথচ বিঘোষণার ব্যাপার নয়, তথ্যের ব্যাপার। জনতা আপাতত নিরক্ষর হ'তে পারে, কিন্তু জনতা বোকা নয়, তুলনাগত অপকৃষ্টকে চিনতে তাদের অসুবিধা হয় না, এবং যদি অপকৃষ্টের বিকল্প হয় অন্য অপকৃষ্ট, তা হ'লে যে-অপকৃষ্ট তার চমক দিয়ে, তার ঝমক দিয়ে, তার প্রয়োগকুশলতা দিয়ে অন্তত দু'দণ্ডও ভুলিয়ে রাখতে পারবে, জনতা তার দিকেই ঝুঁকবে, যেমন হালে ঝুঁকেছে।

প্রতিভা যেমন সর্বত্রগামী, প্রতিভার অবক্ষয়ও সর্বত্রগামী হয়ে থাকে। গান হোক, নাটক হোক, কবিতা হোক, চলচ্চিত্র অথবা চিত্রকলা হোক, প্রতিটি সৃষ্টিকর্ম একটি অবলম্বনকে সম্বল ক'রে গড়ে ওঠে। অবলম্বনের প্রভাব কোথাও স্পষ্ট, অতি প্রত্যক্ষ, অন্য-কোথাও তা হয় তো আভাসে-ইঙ্গিতে প্রতিভাত। বাঙালি সৃষ্টিপ্রতিভার, চল্লিশের দশক থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত, প্রধান অবলম্বন সাম্যবাদী আন্দোলন: যা-কিছু সৃষ্টিশীল পশ্চিম বাংলার মাটিতে এই

এতগুলি বছর ধ'রে ঘটেছে তা বামপন্থী আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সঞ্জাত প্রেরণাস্থচিত, ক্বচিৎ-কখনো হয় তো বক্তব্য বা প্রকাশের সারাৎ-সার প্রতীপধর্মী হ'লেও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা পার্টির কোনো কর্মসূচী। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত যে-বাঙালি রোমান্টিকতা, ভাষাতে-আবেগে-সংগীতে-জীবনচর্চায় যা সহস্রধারায় নিজেকে পরিব্যাপ্ত করেছে, আমাদের সাম্যবাদী আন্দোলন, আমাদের সর্বত্যাগী আদর্শতন্নিষ্ঠ কমিউনিস্ট কর্মীরা, সেই রোমান্টিকতার ঐতিহ্যবাহী। বাঙালি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, স্বপ্ন দেখবার সাহস তার আছে, স্বপ্ন বাদ দিয়ে সৃষ্টি অসম্ভব এই স্পর্ধিত উক্তি ফাঁসির কাঠে ঝোলবার মুহূর্তে অথবা পুলিশের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার পুণ্যক্ষণে নিটোল প্রত্যয়ে বাঙালি যুবকযুবতী উচ্চারণ করেছে। যে-প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি আমাদের সফল হ'তে হয়, তাহ'লে রোমান্টিকতায় প্রত্যাবর্তন করতেই হবে আমাদের।

গানের প্রসঙ্গ দিয়ে এই আলোচনা শুরু করেছিলাম, সেই প্রসঙ্গ জড়িয়ে নিয়েই আমার এই পাঁচালীর ইতি টানবো। আমাদের মস্ত দুর্ভাগ্য, তথাকথিত আধুনিক বাংলা গানের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা বাদ দিলেও, কী ক'রে অস্বীকার করি যে এমনকি অধুনা-রচিত বেশ-কিছু গণনাট্যের গান পর্যন্ত ক্লান্তিতে-মালিন্যে ছাওয়া, যেন গত তিরিশ বছরে পৃথিবী এগোয়নি, যেন বাঙালি সমাজ এগোয়নি, আমাদের গণজীবনে যেন কোনো নতুন স্পন্দন ধ্বনিত হয়নি, গণনাট্যের গান পর্যন্ত একই জায়গায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে। আমাদের ভয়, ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিম দেশের নর্তন-কুর্তনের অশ্লীলতা-সংবলিত পপ বা রক সংগীত মুম্বাই ছায়াছবি অথবা কংগ্রেসী টেলিভিশনের মধ্যবর্তিতায় আমাদের যুবসমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে আনবে, অপসংস্কৃতির আতঙ্কে ভয়ে নীল হয়ে আসছি আমরা, কিন্তু তা প্রতি-রোধের কোনো সদর্থক পরিকল্পনা নিয়ে বিশ্লেষণ বা চিন্তা চোখে পড়েনি, যুবসমাজকে সমান সম্মোহে আকৃষ্ট করানো যেতে পারে এমন কোনো বিকল্পের প্রসঙ্গ কেউ উত্থাপন করেননি। অথচ অন্য দিকে এমনকি রক সংগীতেরই ইতিবাচক লক্ষণগুলি সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে শুরু ক'রে পূর্ব ইওরোপের প্রায় সব ক'টি সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে, জনশ্রুতি, চীনেও তা একটু-একটু ক'রে গৃহীত হচ্ছে। আমি এটা বলছি না যে যেহেতু সমাজতান্ত্রিক দেশে পর্যন্ত রক সংগীত এখন গ্রহনীয় অতএব তা আমাদেরও

মেনে নিতে হবে। কিন্তু কিছু-কিছু বিশ্বব্যাপী প্রবাহের প্রভাব আমাদের সমাজের যুবকযুবতীদেরও – বিশেষ ক'রে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত যুবকযুবতীদের, যাদের সামাজিক ভূমিকা আমাদের পক্ষে উপেক্ষা করা বর্তমান মুহূর্তে অসম্ভব – কাছে টানবে, জেদ ক'রে এই সত্য এড়িয়ে যাওয়া নিছক রোমান্টিকতাবিরোধিতা নয়, তা আসলে বাস্তবতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধঘোষণা। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষিতে এমনকি রক সংগীত নিয়েও সৃজনশীল পরীক্ষা সম্ভব কিনা, অন্তত তা নিয়ে প্রগাঢ় আলোচনা শুরু হ'লে তাতে এমন-কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, বরঞ্চ সাম্য-বাদী কর্মীদের দিগ্‌নির্দেশে, সাম্যবাদী ভাবনা-অনুভাবনার প্রেরণায় এই আলোচনা চললে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। গোটা পৃথিবীতে উথাল-পাথাল অনেক-কিছু ঘটছে। এই এ-বছরই প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দেশের টেলিভিশনের প্রচারব্যবস্থা সংযুক্ত ক'রে নিয়ে, একাদিক্রমে প্রায় তিরিশ ঘণ্টা জুড়ে, মার্কিন দেশ থেকে পশ্চিম ইওরোপ, পশ্চিম ইওরোপ থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন, সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বহু দেশের প্রধান-প্রধান রক সংগীতগোষ্ঠীর নৈপুণ্যপ্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আফ্রিকার দুর্ভিক্ষাক্রান্ত জনগণের জন্য হাজার-হাজার কোটি টাকা তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, নর্তন-কুর্তন-চীৎকার-শীৎকারঅধ্যুষিত রক সংগীতকেও যে-সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা চলে, সারা বিশ্বের কাছে তার প্রমাণ হিশেবে। সুতরাং সবিনয়ে বলবো, আমাদের বাঙালি সমাজেও পরীক্ষা চলুক, বহুরকম পরীক্ষা, আসুন, রোমান্টিকতায় ফিরি আমরা, সমাজ-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখার চেয়ে বড়ো রোমান্টিকতা কিছু নেই, যারা আমাদের মধ্যযুগের অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চায় তাদের প্রতিহত করার লক্ষ্য নিয়ে অভিনব পরীক্ষায় মগ্ন হওয়াটা আমাদের সাম্যবাদী অধিকার, সাম্যবাদী দায়িত্বও সেই সঙ্গে, অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে···

—